পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ১৬ তম সংখ্যা

২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

চট্টগ্রামে স্থানীয় একটি হোটেলে সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর খলীফা (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসের আহমদ সাহেব।

উপস্থিত সুধী মন্ডলীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী

সুধীবৃন্দের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখছেন জনৈক সাংবাদিক জনাব গোলাম মোর্শেদ

কুরবানী জাতিকে জীবিত করে

আসছে ঈদুল আয্হা উপলক্ষ্যে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বাংলাদেশের আপামর জনগণকে বিশেষ করে আহমদী ভাই-বোনকে জানাই পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

এ ঈদ আমাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক-অদ্বিতীয় পুত্রকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি কুরবানী ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয় তখন এক প্রকার বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কুরবানীর মাধ্যমেই জাতি জীবিত হয় ও দীর্ঘ জীবন লাভ করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানী করার দৃঢ় মনোভাব গ্রহণের ফলে হাজার হাজার বছর পরে আজও তিনি জীবিত, মরেও তিনি হয়েছেন অমর এবং সারা বিশ্বের মুসলমান তাঁর ওপরে দুরূদ পাঠ করে থাকে।

এক জনমানবহীন এলাকায় যেখানে পানি ও খাবারের অভাব ছিলো সেখানে তাঁর (আঃ) আদরের একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে তিনি ছেড়ে আসেন। ফলে ধীরে ধীরে ঐশী প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে মক্কা নগরী গড়ে ওঠে এবং বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে সেখানে। তাই কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার বিরাট বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

আমরাও যদি সেই আবেগ ও প্রেরণা নিয়ে আমাদের সব কিছু আল্লাহ্‌র ধর্ম ইসলাম ও আহমদীয়তের উদ্দেশ্যে কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাই তাহলে আমরাও যে স্মরণীয় ও বরণীয় হতে পারবো তা বলাই বাহুল্য।

বর্তমান কুরবানীর প্রেক্ষাপটে আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যারা স্বচ্ছল তাদের উচিত তারা যেন ঐসব স্থানীয় জামাতে কুরবানীর ব্যবস্থা করেন যেখানে কুরবানী দেয়ার লোক কম বা নেই বল্লেই চলে। আর এ ব্যাপারে তারা খাকসারের সহযোগিতাও নিতে পারেন। কিছু দিন পূর্বে হুযূর (আইঃ) একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, বৃটেনে আমাদের দেশের মত কুরবানী দেয়ার সুযোগ-সুবিধা নেই। কসাইখানার মাধ্যমে কুরবানী করতে হয়। এমতাবস্থায় তিনি তাদের কুরবানী পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে করাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে তাদের কুরবানীও যথাযথভাবে হয়ে যাবে এবং গরীব লোকেরাও স্বাচ্ছন্দ্যে মাংস খেতে পারবে। আর অস্বচ্ছল জন-গোষ্ঠী যাতে বছরের এ দিনগুলোতে মাংস খাওয়ার সুযোগ পায় কুরবানীর এ-ও একটি মহান উদ্দেশ্য।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ১৬তম সংখ্যা

১৭ ফাল্গুন ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ২২ যিলকদ ১৪২০ হিঃ কাঃ
২৯ তবলীগ ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

আসুন আমরা তাকওয়ার পোষাকে সুসজ্জিত হই!

মহান আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন- খুযূ যিনাতাকুম ইনদা কুল্লি মাসজিদিন অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেক মসজিদে সৌন্দর্য অবলম্বন করো। পরে বলা হয়েছে- লিবাসুত্তাকওয়া খায়ের অর্থাৎ তাকওয়ার পোষাকই উত্তম। উল্লেখ্য, মসজিদকে সজ্জিত করতে বলা হয়নি, বলা হয়েছে নিজেদেরকে তাকওয়ার পোশাকে সুসজ্জিত হতে। এমনকি হাদীস পাঠে এ-ও জানা যায় যে, শেষ যুগে মসজিদগুলো হবে বিরাট বিরাট চাকচিক্যপূর্ণ কিন্তু হেদায়াত- শূন্য থাকবে। এ সজ্জিত হওয়ার আদেশটি মসজিদে নবুবী, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বর্ষা হলে যে মসজিদে সিজদার সময় কপালে কাদাও লেগে যেতো, অথচ সেই মসজিদের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ সজ্জিত হওয়ায় বিষয়টি প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন জাগে তাকওয়া কী ?

সাধারণভাবে তাকওয়ার অর্থ খোদা-ভীরুতা, ভয়-ভক্তি ও ভালবাসার সাথে প্রেমাস্পদ ও আরাধ্যজনকে সমীহ করে চলা। তাঁর মান-মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা যেন কোনক্রমেই তা ক্ষুণ্ন না হয়। তিনি যেন কোনভাবে নারাজ না হন। বাঘ ভালুককে যেভাবে ভয় করা হয় এ ভয় সেই ভয় নয়। প্রেমাস্পদের কোন্ জিনিষটা ভাল লাগে কোনটা তার অপসন্দ এ ব্যাপারে মানুষ যেভাবে সচেতন থাকে বা যেভাবে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হয়, খোদার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন বলতে আমরা তা বুঝতে পারি। কোন কোন বুযর্গ তাকওয়া বুঝাবার জন্যে এভাবে উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন একজন মানুষ এমন একটি রাস্তা অতিক্রম করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করে যার দু'পার্শ্বে কাঁটার গাছ রয়েছে যেন তার কাপড় না ছিঁড়ে বা তার গায়ে কাঁটার খোঁচা না লাগে। আবার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলার সময়ে মানুষ সাবধান হয়ে চলে যেন বাঘ ভালুক বা সাপের সম্মুখীন হতে না হয়। তাকওয়ার ব্যাপারটাও কতকটা তাই। মানুষ যেন সর্বদা আল্লাহ্‌তাআলার রাজি ও নারাজির দিকটাকে বেশী করে লক্ষ্য রাখে। দিনের শুরু থেকে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত যদি কোন ব্যক্তি তার প্রতিটি পদক্ষেপে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে যে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি কর্মে খোদা সন্তুষ্ট আছেন তো, খোদা তার প্রতি নারাজ তো নন। এটাকেই বলে তাকওয়া অবলম্বন। যে কোন কর্ম কেবল এবং কেবল-ই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যেন হয় তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।

ধর্মের ভিত্তিই হলো তাকওয়া। যে কর্মের ভিত্তি তাকওয়ার ওপরে নয় তা সৎকর্ম হতে পারে না। আর তা খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়। সুতরাং আমাদের অন্তর যদি আমরা তাকওয়ার পোষাকে আচ্ছাদিত করতে সক্ষম হই তাহলে আমরা সত্যিকার সৌন্দর্যে মন্ডিত হতে পারবো তাতে কোন সন্দেহ নেই। নচেৎ আমাদের সকল কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট কোন প্রকার কপটতা ও ধোঁকা বাজির অবকাশ নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সর্বদা তাকওয়ার ওপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখো, কোন কর্ম খোদা পর্যন্ত পৌছিতে পারে না, যাহা তাকওয়া-শূন্য। প্রত্যেক পুণ্যের মূল তাকওয়া। যে কাজে এই মূল বিনষ্ট হইবে না ঐ কাজও বিনষ্ট হইবে না (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ৩১)। তিনি আরও বলেন, "আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক শোভা তাকওয়া হইতেই সৃষ্টি হয়। তাকওয়া ইহা যে, মানুষ খোদার সকল আমানত ও ঈমানের অঙ্গীকার ও তদ্রূপেই সৃষ্টির সকল আমানত ও অঙ্গীকার-এর প্রতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য রাখিবে অর্থাৎ উহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দিকসমূহের প্রতি সাধ্যমত খেয়াল রাখিবে (বারাহীনে আহমদীয়া পরিশিষ্ট, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠ-৫১, ৫২)।

সংশোধনী

(পাক্ষিক আহমদী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০ইং সংখ্যায় সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২০	তাহলে	তা না হলে
১	২৪	একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী	একটি কড়া সতর্কবাণী
১	৩৬	অধিষ্ঠিত না করা যাবে	অধিষ্ঠিত করা যাবে। - - -

– নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ মিথ্যাচারিতা	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ নিশানে আসমানী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ উৎকৃষ্টতম পুণ্য – রসূল-প্রেম ও তার মাহাত্ম্য হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫-৮
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আহমদী শহীদগণের স্মরণে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা বশীরুর রহমান	৯-১৬
❑ কবিতা – রহমতের বারিধারা	ঃ মিস রুশদা রাহাত কবরী	১৬
❑ ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (মরহুম)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৭-১৮
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৯-২০
❑ মু'মিন ও ওসীয়্যত	ঃ জনাব এ, কে, রেজাউল করীম	২১
❑ দজ্জালী ফিতনা	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২২-২৩
❑ আমরা কেন আহমদী হয়েছি ঃ সত্যতার ৯টি প্রমাণ	ঃ অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ	২৪-২৫
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (শিক্ষার্থীদের রাজপথ) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৬-২৭
❑ পুস্তক আলোচনা ঃ তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন	ঃ জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	২৮-২৯
❑ ইসলামী প্রতীকসমূহের ব্যবহার আহমদী ফিরকার জন্য আইনতঃ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কি ?	ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মাযহারুল-হক	৩০-৩৫

প্রচ্ছদ ঃ (১) সালানা জলসা, সুন্দরবন জামাতে (১৮-১৯ ফেব্রুয়ারী) বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব, (২) সালানা জলসা, চট্টগ্রাম জামাতে (২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী) বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব।

সংবাদ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০তম সালানা জলসা ২০০০ উদযাপিত

২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০০ শুক্রবার ও শনিবার আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০তম সালানা জলসা ২০০০ মসজিদ বায়তুল বাসেত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। জলসা মোট ৩টি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহরতম রাজা নাসির আহমদ সাহেব, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল আমীর, মোহতরম তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মাওলানা সালেহ আহমদ প্রমুখ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় আমীর মোবাশ্বের উর রহমান এর সভাপতিত্বে ২৫শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় জলসার ১ম অধিবেশন শুরু হলে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেয সরদার আনোয়ার হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মাওলানা রাজা নাসির আহমদ হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব নেছার আহমদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পরে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। এরপর "আহ্‌মদীয়া জামাত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার" এবং "খেলাফতের আশীষসমূহ" বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মাওলানা রাজা নাজির আহমদ সাহেব। জলসার ১ম অধিবেশনের পর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

২৬শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম জনাব এস, এ, নিজামী সাহেবের সভাপতিত্বে ২য় অধিবেশন শুরু হয়। উল্লেখ্য, এ অধিবেশনটি বিশেষভাবে লাজনার উদ্দেশ্য নিবেদিত ছিল। কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পেশ করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রামের দু'জন সদস্যা। এরপর "জান্নাতি সমাজ গঠনে জান্নাতি পরিবারের ভূমিকা" এবং "অগ্রযাত্রার পথে মোখালেফাত ও কুরবানী ঃ আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাস থেকে" বিষয়সমূহের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে মাওলানা সালেহ্ আহমদ, এবং মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩ ঘটিকায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে "মোল্লার ইসলাম বনাম আল্লাহ্‌র ইসলাম" বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

(এর বাকী অংশ ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আন'আম-৬

৯৫। এবং (এখন) তোমরা আমাদের সম্মুখে তেমনি একা একা উপস্থিত হয়েছ যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম আর আমরা তোমাদিগকে যা কিছু দান করেছিলাম তা তোমরা তোমাদের পিঠের পিছনে[৮৭৮] ছেড়ে এসেছো ! এবং আমরা যে (এখন) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীকে দেখতে পাচ্ছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা ধারণা করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র) শরীক। এখন তোমাদের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমরা যা কিছু ধারণা করতে এখন সে সব তোমাদের নিকট হতে উধাও হয়ে গিয়েছে। ১১ রুকূ

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্য-বীজ ও আঁটিসমূহের অংকুর উদ্ভেদকারী।[৮৭৯] তিনি মৃত হতে জীবিতকে বের করেন এবং তিনিই জীবিত হতে মৃতের বহিষ্কারকারী। এইতো তোমাদের আল্লাহ্ ; অতএব, তোমাদিগকে কোন্ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

৯৭। তিনি উষার উন্মেষকারী এবং তিনিই রাত্রিকে আরামের জন্য[৮৮০] এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য[৮৮১] সৃষ্টি করেছেন। ইহা মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানীর অমোঘ পরিমাপ।

৯৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি[৮৮২] সৃষ্টি করেছেন যেন ওগুলোর সাহায্যে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকাররাশির মধ্যে পথ নির্ণয় করতে পার। আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

৯৯। আর তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে এক-ই আত্মা হতে উদ্ভুত করেছেন, এবং (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও এক স্থায়ী বাসস্থান রয়েছে।[৮৮৩] আমরা বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

১০০। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করি এবং ঐগুলি থেকে সবুজ তরুলতা বের করি, যা হতে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত শস্য দানা উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ হতে অর্থাৎ উহার মাথি হতে কাঁদিসমূহ (বের) হয়, যা ভারে ঝুঁকে পড়ে। এবং আমরা আঙ্গুর ও যয়তুন এবং ডালিমের বাগানসমূহ সৃষ্টি করি, যাদের মধ্যে কিছু পরস্পর সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর তার ফলের প্রতি যখন তাতে ফল ধরে এবং এর পরিপক্ক হওয়ার প্রতিও। নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী।[৮৮৪]

৮৭৮। এর মর্ম হচ্ছে– আমরা তোমাদিগকে অনেক কিছু দান করেছিলাম যদ্বারা তোমরা তোমাদের আত্মিক অবস্থার উন্নতি করতে পারতে, কিন্তু তোমরা সেগুলিকে পশ্চাতে ফেলে এসেছো, অর্থাৎ তোমরা ওগুলোকে ব্যবহার কর নি এবং এখন সে সবের ব্যবহার করার আর সময়ও নেই।

৮৭৯। এখানে শস্যবীজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যা হতে চারা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। কত তুচ্ছ ইহা, কিন্তু কীরূপে বৃদ্ধি পেয়ে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। এভাবেই বীজকণার মতই মানুষ ক্রমোন্নতির ধারায় আল্লাহ্‌তাআলার ঐশীবাণী লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর প্রকাশ তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

৮৮০। দিবসে কাজ-কর্ম করে একজন মানুষ যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং রাত্রিতে ঘুমুতে যায়, যার ফলে অবসাদমুক্ত হয়, সেরূপে যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবী করীম (সঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা সুদীর্ঘ রাত্রির বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের মানসিক শক্তিসমূহে পুনঃ সজীবতা লাভ করে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং তাঁর (হযরত মুহাম্মদ-সঃ) পরিচালনাধীন আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ মার্গে আরোহণ করার জন্য বিশেষভাবে যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

৮৮১। বস্তু জগতে সময় নিরূপণ করার জন্যে এবং আলোর উৎসরূপে সূর্য এবং চন্দ্র যেরূপ অপরিহার্য, সেরূপ আল্লাহ্‌তাআলার নবীগণও অপরিহার্য।

৮৮২। রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি যেমন পথিকের পথ প্রদর্শন করে, সেভাবে ঐশী এবং আধ্যাত্মিক সাধকও আত্মিক-অন্ধকারে দিশেহারা বিভ্রান্ত মানবকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

৮৮৩। "মুসতাকাররুন" অর্থ অস্থায়ী আবাস এবং "মুসতাওদাউন" অর্থ স্থায়ী বাসস্থান; অথবা প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা মৃত্যু এবং পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দ শেষ বিচারের দিন বা পুনরুত্থানের পরের জীবন বুঝায়। আয়াতের মর্মার্থ হল, আল্লাহ্‌তাআলা মানব জাতিকে 'এক স্থান হতে' সৃষ্টি করে বহু সংখ্যায় বর্ধিত করেছেন, ইহা উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মানব সৃষ্টি করে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন তা হলঃ তিনি কেবল এই পৃথিবীতেই তাদের আবাসকাল নির্ধারিত করেন নি বরং মৃত্যুর পরে এক চিরস্থায়ী জীবনেরও ব্যবস্থা করেছেন যেখানে ধার্মিক লোকেরা তাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। সত্যই, কী মহিমান্বিত উদ্দেশ্য! সেখানে তারা একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত নবীগণের অনুসরণেই উন্নীত হতে পারে।

৮৮৪। এখানে ঐশী-বাণীকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; এবং যদি ঐশী বাণী সত্যই আল্লাহ্‌তাআলার রহমতস্বরূপ হয়ে থাকে, তা হলে যখনই কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে তখনই কেন বিবাদ, শত্রুতা, মতভেদ ও লড়াই হয়েছে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। এতে বলা হয়েছে যে, বৃষ্টি হলে যেমন ভাল এবং মন্দ উভয় গাছপালাই মাটিতে সুপ্ত বা গুপ্ত বীজ অনুযায়ী বেড়ে উঠে, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ্‌র নবীর আবির্ভাবে মানুষ, যারা এতকাল পরস্পর মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তারা ভাল এবং মন্দ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'সদৃশ' এবং 'বিসদৃশ' শব্দদ্বয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে যে, কতকগুলি ফল একে অন্যের অনুরূপ এবং কতকগুলি একটি অন্যটি হতে ভিন্ন রূপ।

বিভিন্ন প্রকার ফলের জন্যে ইহা প্রযোজ্য হতে পারে, সেগুলি কোন কোন দিকে একটি অন্যটির সদৃশ এবং অন্যদিক দিয়ে বিসদৃশ, অথবা একই শ্রেণীর ফলের জন্য প্রযোজ্য যদিও সেগুলি মোটামুটি প্রায় এক রকম, তবে সামান্য বৈসাদৃশ্য রয়েছে, কতকগুলি অন্যগুলি হতে বেশী মিষ্ট এবং কতকগুলো আবার রং বা আকারে বিসদৃশ। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও যারা আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত নবীকে গ্রহণ করে এবং ঐশী-নির্দেশ মেনে চলে তাদের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। তারা একজন অন্য জনের সাথে এক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য বহন করে, আবার অন্য বিষয়ে বিসদৃশ হয়ে থাকে। কেউ কেউ অন্যান্যদের হতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধিক অগ্রগামী হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক ধাপ বেশী অগ্রগতি লাভ করে, অন্যেরা ভিন্ন স্তরে অধিক আগে বেড়ে যায়। তারা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধিলাভ করে, এবং তাদের মধ্যে নিজ নিজ প্রাকৃতিক যোগ্যতা ও স্বাভাবিক মেযাজ অনুযায়ী ভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। "উহার পরিপক্কতা" শব্দদ্বয় ফল পেকে যাওয়ার উপমা দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য প্রকাশ করছে। ঠিক যেমন একটি অপরিপক্কফলের নমুনা দ্বারা সেই শ্রেণীর সমস্ত ফলের বিচার করা অশোভন, তেমনি ঐশীবাণীর ফলাফলের মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাও অন্যায়, কারণ বিশ্বাসীগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তখনও আধ্যাত্মিক উন্নতির পর্যায়ে অগ্রসরমান রয়েছে কিন্তু পূর্ণতায় পৌঁছে নি।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা

কুরআন ঃ

فَقُلْنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٧﴾

এবং আমরা বলেছিলাম, 'তোমরা উভয়ে সেই জাতির নিকট যাও যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।' অতঃপর আমরা তাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিলাম।

(সূরা ফুরকান ঃ ৩৭)

হাদীস ঃ

আন আবদিল্লাহে (রাঃ) ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে (সঃ) আলায়কুম বিস্‌সিদকে ফাইন্নাস্‌সিদকা ইয়াহ্‌দী ইলাল বিররে ওয়া ইন্নাল বিররা ইয়াহ্‌দী ইলাল জান্নাতে ওয়ামা ইয়াযালুর রাজুলু ইয়াসদুকু ওয়া ইয়াতাহাররাস্‌ সিদকা হাত্তা ইউকতারা ইনদাল্লাহে সিদ্দীকান, ওয়া ইয়্যাকুমুল কাযেবা ফাইন্নাল কাযেবা ইয়াহ্‌দী ইলাল ফুযুরে ওয়া ইন্নাল ফুযুরা ইয়াহ্‌দী ইলান্নারে ওয়ামা ইয়াযালুর রাজুলু ইয়াকযেবু ওয়া ইয়াতাহাররাল কাযেবা হাত্তা ইউকতাবা ইনদাল্লাহে কায্‌যাবা (মুসলিম)।

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন যে, সত্যকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সত্যতা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায় ও পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলে সে আল্লাহ্‌র নিকট সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। মিথ্যা হতে বাঁচো, কেননা মিথ্যা পাপ-অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ-অবাধ্যতা মানুষকে আগুনের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলে সে আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌তাআলা নিজেও তাঁর রসূল দ্বারা মানুষকে তাঁর শাস্তি হতে বাঁচার প্রতিটি রাস্তাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে সকল পাপ আল্লাহ্‌র নিকট সবচে' বেশী ঘৃণ্য তার মধ্যে মিথ্যা অন্যতম। ধরতে গেলে সকল পাপের জননী হলো মিথ্যা।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) এ সম্বন্ধে বলেন, "একথা ধরে নেয়া গেল যে, মিথ্যা দ্বারা কোন মানুষ কোন সাময়িক উপকার পেল কিন্তু বাস্তব কথা হলো এই যে, মিথ্যাকে অবলম্বন করলে মানুষের হৃদয় কালো হয়ে যায়। তার ভিতরে ঘুণে ধরে যায়। এবং এক মিথ্যার জন্য তাকে অনেক মিথ্যা বলতে হয়। কারণ সে মিথ্যাকে সত্যের রূপ দিতে চায়। আর এভাবে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষ হতে থাকে। ..... মনে রেখো মিথ্যা এক মস্ত বড় আপদ যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়' (মলফুযাত, প্রথম খন্ড)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে মিথ্যা হতে পরিত্রাণ দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ,
সদর মুরব্বী

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তকের কয়েকটি পাতায় কতিপয় ওলীউল্লাহ্‌ এবং আত্মবিলীনকারীদের সাক্ষ্য উল্লেখ করা হলো। এঁরা এ অধমের দীর্ঘকাল পূর্বে এ অধম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে গেছেন। তাঁদের অন্যতম গোলাব শাহ্‌ নামক এক আত্মবিলীনকারী ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তিনি আমাদের এযুগ হতে ত্রিশ বা একত্রিশ বৎসর পূর্বে এহেন নশ্বর জগৎ হতে বিদায় নিয়ে গেছেন। যদিও এ ভবিষ্যদ্বাণীটি "এযালায়ে আওহাম" পুস্তকের ৭০৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত -ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এবার বর্ণনাকারী সেই ব্যক্তি ঘটনার সকল দিক একাধারে ভালরূপে স্মরণ করে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন ভবিষ্যদ্বাণীটি পৃথকভাবে একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয়।

বর্ণনাকারী মিঞা করীম বখশ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এত দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমানী জোশ ও উৎসাহের সাথে ব্যক্ত করেছে যে, যদি কোন সত্যান্বেষী মনোযোগী হয়ে শুনে তা হলে ইহা অসম্ভব যে, তার অন্তরের উপর উহার পূর্ণ এবং বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তৃত হবে না। আমি মিঞা করীম বখশকে ইদানিং (১৮৯২ সালের মে মাসে) লুধিয়ানায় ডেকে এনে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পুনরায় ভালরূপে তদন্ত করলাম এবং পরে বিভিন্ন মজলিসে তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এ সম্পর্কে সুদৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে, সত্য সত্য কথা যা তার ভালরূপে স্মরণ আছে তা-ই যেন সে বর্ণনা করে এবং অণুমাত্রও সন্দেহ ও সংশয় -পূর্ণ কথা না বলে। তাকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যদি একচুল পরিমাণও অবাস্তব কথা বলে বা সংশয়পূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করে বা যা তার সঠিকভাবে স্মরণ নেই সে কথা বলে তাহলে খোদাতাআলার সম্মুখে সেজন্যে তাকে জওয়াবদেহী করতে হবে। বরং সত্যতার পরীক্ষার জন্য খুব ভালভাবে সেই পীর-পুরুষকে বলা হয়েছে যে, আপনি এখন এই কথাটি ভাল করে চিন্তা করে নিন এবং বুঝে নিন যে, যদি আপনার বিবরণের একটি শব্দও অবাস্তব হয় তা হলে এর বোঝা আপনারই নিজের স্কন্ধে বহন করতে হবে এবং হাশরের দিনে সেই অভিশাপের মালা আপনার গলায় পরতে হবে যা মিথ্যাবাদীদের গলায় পরানো হয়। অতঃপর তাকে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে, হে মিঞা করীম বখশ! আপনি এক পীর-পুরুষ এবং যেভাবে শুনা যায় যে, তাকওয়া এবং নামায রোযা সযত্নে পালন করার মধ্যে আপনার জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে, এখন এই কথাকে স্মরণ রাখুন যে, যদি মিঞা গোলাব শাহ্‌'র এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যা আপনি এই অধম সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকেন, এক সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ বিষয় বা অবাস্তব কথা হয়ে থাকে তাহলে ইহা বর্ণনা করার ফলে আপনার পূর্ববর্তী সকল পুণ্যকর্ম ব্যর্থ ও বিনাশ হয়ে যাবে। আপনি মনে দুঃখ নিবেন না, নিশ্চিত মনে রাখবেন যে, এই মিথ্যাবানানোর শাস্তিতে আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং যদি এই কথা নিশ্চিত ও বাস্তব না হয়ে থাকে তা হলে আমার খাতিরে আপনি নিজের ঈমানকে নষ্ট করবেন না। আমি আপনার এই জগতেও কাজে আসতে পারি না এবং পরজগতেও না। যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে খোদার সামনে হাযির হবে তার ভাগ্যে অবশ্য সেই জাহান্নামই জুটবে যার মধ্যে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে নিজে মিথ্যা কথা রচনা করে তার মালিককে অসন্তুষ্ট করে, বড়ই হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে অপরাধমূলক কাজ করে সারা জীবনের পুণ্যকর্মকে বিনাশ করে ফেলে।

(অবশিষ্টাংশ ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উৎকৃষ্টতম পুণ্য–রসূল-প্রেম ও তার মাহাত্ম্য

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১২ নভেম্বর, ১৯৯৯ইং মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

"যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে পাশ কাটায় এবং তাঁর যিক্‌র (স্মরণ) করতে বিব্রত বোধ করে, কিয়ামতের দিনে তাদেরকে ওরূপ সম্পর্কহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে।"

"সর্বোৎকৃষ্ট পুণ্য হচ্ছে খোদার জন্যই কাউকে ভালাবাসা এবং খোদার জন্যই ঘৃণা করা।"

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরাতুল-মায়িদাহ্-এর ৩৬তম আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অর্থ 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের ওসিলা (উপায়) অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। নৈকট্যলাভের ওসিলা অন্বেষণ কর কথাটির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ওসিলাস্বরূপ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপায় খোদাতাআলার নৈকট্য লাভের ওসিলা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছিঃ

হযরত আবূযর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'উৎকৃষ্টতম পূণ্য হচ্ছে খোদার জন্য (কাউকে) ভালবাসা এবং খোদার জন্যই ঘৃণা করা' (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ্)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌কে ভালবাস, এ জন্য যে, তিনি বিভিন্ন রকমের অসংখ্য নেয়ামতের দ্বারা তোমাদেরকে রিযিক যোগান এবং আমাকে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার দরুন ভালবাস এবং আমার আহ্‌লে বায়তকে আমার প্রতি ভালবাসার কারণে ভালবাস' (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব)।

উবাদাহ্ বিন সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর পাক (সঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে ভালবাসে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন এবং যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে অপসন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন না' (তিরমিযী, কিতাবুল্ জানায়িয)। এর দ্বারা কেবল আখেরাতের সাক্ষাতকে বুঝায় না। বরং দুনিয়াতেও সাক্ষাত আছে। যারা ইহকালে আল্লাহ্‌কে পাশ কাটায় এবং তাঁর যিক্‌র (স্মরণ) করতে অস্থিরতা বোধ করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ওরূপ সম্পর্কহীন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করা হবে। অতএব এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এ শুধু কিয়ামতকালের বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ওরূপ হবে। বরং এ দুনিয়াতেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করে এবং তাঁকে পসন্দ করে সে ব্যক্তিই কিয়ামত-কালেও আল্লাহ্‌তাআলার প্রিয় হবে।

হযরত কাতাদাহ্ বিন নো'মান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহ্ কাউকে ভালাবাসেন তখন তাকে তিনি দুনিয়া থেকে সেরূপ রক্ষা করেন যেরূপে তোমাদের মধ্যে কেউ (কোন) রুগীকে পানি

থেকে রক্ষা করে। এর দ্বারা এই বুঝায় যে, কোন কোন রোগ এতো কঠিন হয়ে থাকে যে, ঐ সব রোগাক্রান্ত রুগীর ওপর পানি ঢালা তার জন্য মারত্মক হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ দুনিয়াদারী (পার্থীবতা) থেকে রক্ষা করেন যেমন কিনা তোমরা কোন রুগীকে পানি থেকে রক্ষা করে থাক।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'পরীক্ষা যত বড় হবে প্রতিদানও তত বেশী দেওয়া হবে, এবং আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব, যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি। আর যে অপসন্দ করে তার জন্য রয়েছ তাঁর অসন্তুষ্টি' (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতান)। উল্লিখিত বিষয়গুলো এরূপ সুস্পষ্ট যে, এগুলোর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, 'কিয়ামত কবে হবে?' তিনি বললেন, 'তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?' সে বললো, 'কিছুই না। তবে আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সঃ)-কে ভালবাসি।' আঁ হযরত (সঃ) বল্‌লেন, 'তুমি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালবেসেছ' (সহী বুখারী, কিতাবুল মানকিব)।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি এবং নবী করীম (সঃ) মসজিদ থেকে বেরুচ্ছিলাম। তখন মসজিদের দোরগোড়ায় এক ব্যক্তিকে আমরা পেলাম। সে বললো, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! কিয়ামত কবে আসবে? নবী করীম (সঃ) বললেন,তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?' অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে তো জিজ্ঞেস করছো কিন্তু এর জন্য কি কিছু প্রস্তুতিও নিয়েছ ? সে ব্যক্তি তাতে হতভম্ব হয়ে পড়লো। তারপর সে বললো, এর জন্য আমি অনেকগুলো রোযারও আয়োজন করি নি, আর অনেক নামায এবং সদকারও আয়োজন করিনি। কিন্তু একটি ব্যাপার অবশ্য আছে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসি।' তিনি (সঃ) বল্‌লেন, 'তুমি তার সাথে থাকবে যাকে তুমি ভালবাস' (বুখারী, কিতাবুল আহ্‌কাম)।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাস্‌উদ (রা) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং বললো, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে-ব্যক্তির সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু সে তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি?

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'মানুষ তারই সাথে থাকে যাকে সে ভালবাসে' (বুখারী, কিতাবুল আদাব)। এখন, এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে স্মরণ রাখা উচিত, কেননা তিনি আঁ হযরত (সঃ)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি বলেন, 'জিস্‌মী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শওকিন আলা ইয়া লাইতা কোনাত কুওয়াতুত্ তাইয়ারানি"- 'আমার দেহ (সত্তা) তো এক প্রবল আগ্রহ-আকাঙক্ষার সাথে তোমার দিকে উড়ে চলেছে। হায়! আমার মধ্যে যদি (তদনুযায়ী) উড়ার শক্তি- সামর্থ্য হতো!' অতএব, 'যে-ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ সে তাদের সাথে মিলিত হয় নি-' এ হাদীসটি হুযূর আকরম সল্লাল্লাহু আলায়েহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপর প্রযোজ্য হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কেবল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কেই ভালবাসতেন না, বরং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) -এর কওম বা সম্প্রদায়কেও ভালবাসতেন। সুতরাং তাঁর অসংখ্য লেখায় তিনি সাহাবা কেরামের প্রশংসা এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অসামান্য গুণ কীর্তন করেছেন।

অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, মানুষ তার সাথেই (গণ্য) হয়ে থাকে যাকে সে ভালবাসে। আহ্‌মদীয়া জামাতের উচিত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে মিলিত হলে আপনারা সাহাবার সাথে মিলিত হবেন। যদি সাহাবাকে ভালবাসেন এবং তাঁদের সাথে মিলিত হবার আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা আপনাদের থাকে, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেনঃ "সাহাবা সে মিলা জাব্ মুঝকো পায়া" (-যখন আমাকে সে পেল তখন সে সাহাবার সাথে মিলিত হল) অতএব, যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে পেয়ে যান তাহলে সেই সঙ্গে সাহাবাকেও পেতে পারেন এবং সাহাবাকে পেতে পারেন না যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে লাভ করেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি তার এক লিল্লাহী ভাই (যাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসতো) অন্য এক গ্রামে যেখানে সে বাস করতো, তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে বেরুলো। আল্লাহ্‌তাআলা তার যাত্রাপথে এক ফিরিশ্‌তাকে নিযুক্ত করলেন। যখন সে ব্যক্তি ঐ ফিরিশ্‌তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন সে (ফিরিশ্‌তা) জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ'? সে উত্তর দিল, 'আমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি'। সে জিজ্ঞেস করলো, কী? আত্মীয়তার কারণে? সে জবাব দিল, 'না'। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কি তার কোন উপকার বা সদ্ব্যবহারের দরুন সৌজন্যের কারণে?' সে বললো, 'না'। সে জিজ্ঞেস করলো, কী সে কারণ যে জন্য তার কাছে যাচ্ছ?' সে ব্যক্তি বললো, একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আমি তাকে ভালবাসি কেবল এজন্যই তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি)।'

অতএব, বিপুল সংখ্যক আগন্তুক যারা জলসার সময় এখানে (কেন্দ্রে) উপস্থিত হন- এই অধমের মধ্যে তো কোন কিছু নেই প্রকৃত সত্য এটাই, কিন্তু তারা অবশ্যই আমাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসেন; অতএব তাদের মুবারক হোক যে, তখন ঐ ফিরিশ্‌তা বল্‌লো, 'শুনো'। আমি তোমার নিকট আল্লাহ্‌র এই শুভবার্তা নিয়ে এসেছি যে, সে-খোদাও তোমাকে ভালবাসেন, এজন্য যে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে খোদার খাতিরে ভালবাস' (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্‌উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্যে সবচে' নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, তাদের মধ্যে যে, আমার প্রতি সবচে' বেশী দুরূদ প্রেরণকারী হবে" (তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, মা জায়া ফি ফায্‌লে সালাতিন আলান নবীয়ে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)। অতএব, **দুরূদের উপর অনেক জোর দেয়া উচিত। রাত-দিন (মুখে-অন্তরে) দুরূদ-এর বিরদ থাকা উচিত। অন্যান্য কথা-বার্তা চলতে থাকা কালেও জিহ্বাতে দুরূদের আবৃত্তিই অব্যাহত থাকা উচিত।**

এই দুরূদের প্রসঙ্গে আমার স্মরণ পড়ে গেল, কিছু লোক আছে যারা এমনিতে দুরূদ পড়ে কিন্তু কথা-বার্তার সময় তারা নোংরা কথা বলে। সেজন্য তাদের দুরূদ পড়া নিষ্ফলই হয়। দুরূদের উপকার তারই হবে যে তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দুরূদ প্রেরণ করে থাকে এবং খেয়াল যদি সরেও যায় কোন কারণে, তবুও জিহ্বা অবলীলায় দুরূদ আবৃত্তি করতে থাকে, এমতাবস্থায় যে, হৃদয়ের অনুগমনে দুরূদ পাঠায়।

হযরত আবু তাল্‌হা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত রসূল করীম (সঃ) ভোর বেলায় অত্যন্ত আনন্দোজ্জ্বল ছিলেন। আনন্দের প্রভা তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত ছিল। সাহাবা-কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আজ আপনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আনন্দের আভাস আপনার মুখমন্ডল থেকে প্রস্ফুটিত দেখাচ্ছে। বল্‌লেন, "আজ আমার প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আগন্তুক আসলো, সে বললো, তোমার উম্মতের যে ব্যক্তিই তোমার প্রতি দুরূদ পাঠাবে, আল্লাহ্ তার জন্য দশটি পুণ্য লিখে দিবেন এবং দশটা পাপ মোচন করে দিবেন এবং দশটি দর্জা বা মর্যাদায় তাকে সমুন্নত করবেন। ঐ দরূদের (গুণগত বৈশিষ্টের) অনুপাতে তার দিকে সওয়াব প্রত্যার্পণ করা হবে" (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)। এখন, এই যে "দুরূদের অনুপাতে' শেষ বাক্যটি রয়েছে তা দশ সংখ্যাটিকে অসীম ও অসংখ্য বলে প্রতিপন্ন করেছে। কেননা, দুরূদের আনুপাতিক বৈশিষ্ট্য যদি অধিক হয় তাহলে কেবল দশটি পুণ্যের প্রশ্ন নয় বরং গণনাতীত পুণ্য তার স্বপক্ষে লিখা হবে। এবং কেবল দশটি গোনাহ্ ঝরে যাবার কথা নয় বরং গোনাহ্ ঝরে যাবার পর তাকে পুণ্যে ভুষিত করার ধারা শুরু হয়ে যাবে। অতএব, হাদীসটিতে যে শেষ বাক্যটি রয়েছে তদনুযায়ী এই দুরূদের আনুপাতিক বৈশিষ্ট্যের দিকে সওয়াব প্রত্যার্পিত হবে। এটা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দুরূদের প্রতিদানকে সীমাহীন করে দেখায়।

এখন পরিশেষে আমি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি ও উপদেশ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আজ যেহেতু জুমুআর নামাযের পর কয়েকটি বিবাহও পড়ান হবে সেজন্য আমি অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপাকারে বিষয়াবলীর আয়োজন করেছি। কেননা, বিবাহ পড়াতে এতো সময় লেগে যাবে যতটা সাধারণতঃ জুমুআতে লেগে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "পরীক্ষার সময়ে আমার দুশ্চিন্তা হয় আমাদের জামাতের কতিপয় দুর্বলচিত্ত লোকদের সম্বন্ধে। আমার অবস্থা এই যে, আমার নিকট যদি (খোদার পক্ষ থেকে) এই আওয়াজ আসে যে, 'তুমি পরিত্যক্ত' তোমার কোনও কামনা আমি পূরণ করবো না' তবুও

খোদাতাআলার শপথ করে বলছি যে, ঐশী প্রেম ও ভালবাসায় এবং ধর্মের সেবায় কোনও ত্রুটি ঘটবে না; কেননা আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি' (মলফুযাত, ১মখন্ড, নবসংস্করন, পৃ ৩০২)

অতঃপর বলেন, "জীবন যদি খোদারই জন্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি এর হিফাযত করবেন সহী বুখারীতে একটি হাদীস আছে, 'যে-ব্যক্তি খোদাতাআলার সাথে ভালোবাসার যোগাযোগ সৃষ্টি করে নেয়, খোদাতাআলা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ হয়ে যান।' অপর একটি হাদীসে আছে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব এ পর্যায়ের হয়ে থাকে যে, আমি (আল্লাহ্) তার হাত, পা ইত্যাদি-এমন কি, তাঁর জিহ্বা স্বরূপ হয়ে যাই যার দ্বারা সে কথা বলে। আসল কথা হচ্ছে মানুষ নফ্সের ভাবাবেগ-মুক্ত হয়ে যায় এবং সে- ব্যক্তি প্রবৃত্তির মন্দ বাসনা ত্যাগ করে খোদার ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়। তখন তার কোনও কাজ নাজায়েয হয় না, বরং (তার) প্রতিটি কর্ম খোদার অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়ে থাকে। তার চেয়েও এগিয়ে– খোদাতাআলা তাকে নিজেরই কর্ম বলে অভিহিত করেন। এ হচ্ছে ঐশী নৈকট্যের সেই একটি মাকাম (স্তর), যেখানে উপনীত হয়ে 'সলূক' (ঐশী অভিযাত্রা)-এর মঞ্জিলসমূহ পুরোপুরিভাবে যারা অতিক্রম করে নি তারা হয়তো পদস্খলিত হয়েছে অথবা 'ইলাহীয়াত' সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং ঐশী নৈকট্যের প্রকৃত মর্ম (বা স্বরূপ) যারা উপলব্ধি করেনি তারা ভুল-বুঝাবোঝির শিকার হয়েছে।"

এই যে আল্লাহ্তাআলা বলেন - 'আমি তার হাত হয়ে যাই, তার পা হয়ে যাই, তার জিহ্বা হয়ে যাই'-এর কারণে 'ওহ্দাতুল- ওজূদ' নামের একটি ফির্কা ইসলামে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তারা এতোই সীমাতিক্রমে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তারা বলতো, খোদা যদি তার পা হয়ে যান তাহলে (প্রতীয়মান হয় যে,) খোদা এবং বান্দা একই বস্তু–কোনও পার্থক্য নেই। কতিপয় অন্যান্য ধর্মেও এই রকমের মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার সৃষ্টি হয়, যা এই বিষয়টি (প্রকৃতভাবে) না বুঝার দরুন সৃষ্টি হয়ে যায়। ওহ্দাতুল ওজূদ'-এর মস্লা যদি সত্যসত্যই সৃষ্টি হতে পারতো তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্পর্কে কুরআন করীমে যে সব আয়াত রয়েছে তার দরুনই হতে পারতো- যেমন, 'মা রামাইতা ইয্ রামাইতা ওয়া লাকিন্নাল্লাহা রামা'- অর্থাৎ 'তুমি (হে মুহম্মদ!) যে তীর নিক্ষেপ করেছিলে সে তীর তুমি নিক্ষেপ কর নি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন,' অতঃপর বলেন, 'ইয়াদুল্লাহে ফওকা আইদীহিম,' অর্থাৎ 'যে হাত ছিল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর, তাঁর নিকট বয়াতকারীদের হাতের উপরে, কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, 'তা আল্লাহ্রই হাত যা তাদের হাতের ওপরে' কাজেই 'ওহ্দাতুল ওজূদ'-এর মসলা যদি সৃষ্টি হতে পারতো তাহলে অবশ্যিকভাবে তাঁর (সঃ) ক্ষেত্রেই হতে পারতো। পক্ষান্তরে তিনি সবচে' বেশী তওহীদ (-একত্ববাদ)-এর শিক্ষাদান করেছেন, তওহীদেরই গুণ গেয়েছে। সারা বিশ্বজগতে (অন্য) কোনও নবী তওহীদের সেরূপ খিদমত করেননি যেরূপ হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) করে গেছেন। 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদিওঁয়াবারিক ওয়া সাল্লিম্ ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

এ একই বিষয়-বস্তু সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "কুর্বে ইলাহী (ঐশীনৈকট্য)-এর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে যারা ব্যর্থ হয়েছেন তারাই ভুল বুঝাবোঝিতে লিপ্ত হয়েছেন এবং (ফলতঃ) ওহ্দাতুল-ওজূদ-এর মস্লা গড়ে নিয়েছেন। এ বিষয়টিও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, যেখানেই মানুষ পরীক্ষায় পড়ে থাকে, সেখানে (তার) সে-কাজ (আসলে) খোদাতাআলার ইচ্ছার সঙ্গে অসঙ্গিতিপূর্ণ হয়ে থাকে।"

'যেখানে মানুষ পরীক্ষায় পড়ে সেখানে (তার) সে-কাজ খোদার ইচ্ছার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়'- একথাটি অত্যন্ত গভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা, যা অল্প কথায় বোঝানো কঠিন হবে। প্রকৃতপক্ষে যখনই মানুষ কোন পদস্খলনের শিকার হয়, কোন সন্দেহে আবর্তিত হয় তখন তা এরূপ কর্মের দরুনই, যা খোদাতাআলার ইচ্ছার বিরোধী হয়ে থাকে। হযরত (আঃ) বলেন ঃ

"এরূপ ব্যক্তি তার ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে থাকে, খোদাতাআলার ইচ্ছার অধীনে (সে থাকে) না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআলার 'ওলী' (বন্ধু) বলে অভিহিত হয় এবং খোদা যার জীবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, সে ব্যক্তি ঐরূপ হয়ে থাকে যার কোনও কাজই আল্লাহ্র কিতাবের সাথে পরামর্শ ও বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে (সংঘটিত) হয় না। সে তার প্রত্যেক বিষয়, কথা ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে এবং তাথেকে পরামর্শ (ও ফয়সালা) গ্রহণ করে (মলফূযাত, ১ম খন্ড, নব সংস্করণ, পৃঃ ১১৭)। এখন পরামর্শ গ্রহণ কথাটির অর্থ হচ্ছে, যখনই কোন কাজ করে বা করতে যায়, তখন বারবার তার মনোযোগ কুরআন করীমের আহকামের দিকে নিবদ্ধ হতে থাকে এবং তদনুযায়ী সে কাজ করে। এখন, এটা অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়-বস্তু; সুতরাং আপনারা কার্যত তদ্রূপ করে দেখুন, তাতে জানতে পারবেন, কতো যে কঠিন এই কাজ,-সবসময় কুরআনকে নিজের উপর হাকিম ও বিচারক হিসাবে কায়েম রাখা- এ বিষয়টি অনেক উঁচু মর্তবাসমূহ সম্পর্কিত বিষয়, যা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করছেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যায় এরূপ লোক রয়েছেন যারা এই সকল মর্তবার দিকে ক্রমাগ্রসরমান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই কালাম থেকে, যা তিনি পরম নিষ্ঠাবান বান্দাদের স্বপক্ষে বর্ণনা করছেন, দুর্বলদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। তাদের মনের ভয় দূর করবার জন্য আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, খোদা পর্যন্ত পৌছবার অসংখ্য মর্তবা বা স্তর বিদ্যমান। জরুরী (করণীয়) বিষয় হচ্ছে, সে দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা যেন শুরু করে দেন এবং দোয়া করতে থাকেন। **প্রত্যেক কাজ যেন খোদাতাআলার ইচ্ছার সঙ্গে যা সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেভাবে তা জীবনে রূপ ধারণ করতে থাকে এবং যে সব কাজ খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায় সেগুলি থেকে যেন যথাসাধ্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে থাকেন।**

এই যে অগ্রসরমান হবার অবিরাম চেষ্টা তা আবশ্যকীয়। এবং এরই মাঝে আবার শামিল রয়েছে আল্লাহ্তাআলার অসীমতার বিষয়-বস্তুও। কোন ব্যক্তিই খোদাতাআলার দিকে যাত্রা করতে গিয়ে খোদাতাআলার নাগাল পেতে পারে না, কেননা তিনি অনন্ত-অসীম। নবীরাও পেতে পারেন না, তারা তাঁকে পেয়ে তো থাকেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, যার পরেই 'খোদায়ী' শুরু হয়ে যায়। এবং 'ওহ্দাতে-ওজূদ' এটাই যে, এই মাকামের পরেই শুধুমাত্র খোদা বিদ্যমান। 'সিদ্রাতুল-মুন্তাহা'-এর মাঝেও এ পয়গাম বা তত্ত্বটি-ই দেয়া হয়েছে যে, একটি মার্গ পর্যন্ত আঁ হযরত (সঃ) পৌছলেন আর তার পরেই শুরু হয়েগিয়েছিল 'ওহ্দাতুল-ওজূদ'-এর বিষয়-বস্তু–সেখান থেকেও অগ্রযাত্রা ছিল খোদার অসীমতায় হস্তক্ষেপ।

এই মৌলবীরা তো অদ্ভুত অদ্ভুত কেস্সা-কাহিনী তৈরী করে রেখেছে। অবাক লাগে এই লোকদের জ্ঞানবুদ্ধির বাহার দেখে–এক মৌলবী সাহেব বক্তৃতায় বয়ান করছিলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যখন সিদ্রাতুল-মুন্তাহা-য়

পৌছলেন তখন তিনি চুপ ছিলেন। তখন (নাউযুবিল্লাহ্) খোদাতাআলা সিনেমার এই গানটি গাইলেন, 'চুপ চুপ খাড়ে হো জরুর কোই বাত হ্যায়/ নয়ী মুলাকাত হ্যায়, পহ্লী মুলাকাত হ্যায়'। কী আশ্চর্য! হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তো তাঁর প্রভু আল্লাহ্তাআলার সাহচর্যে সবসময় থাকতেন, কিন্তু (মৌলবীদের ধারণায়) আজকের সিনেমার এই গান কিনা তখন খোদাতাআলা গেয়েছিলেন, যখন রসূলুল্লাহ্র মে'রাজ হয়েছিল। অতএব, মৌলবীরা এই ধরনের কেস্সা - কাহিনী রচনা করে রেখেছে। খোদাতাআলার শোকর করুন যে, আপনারা মুল্লাতন্ত্র-এর কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। এটা আল্লাহ্তাআলার কতইনা বড়ো ইহ্সান। আমি তো এদের (মৌলবীদের) অবস্থা দেখে খোদার শোকর করি কীভাবে যে খোদাতাআলা এই জামাতকে রক্ষা করেছেন এই মৌলভীদের থেকে এবং মৌলবাদ ও মোল্লাতন্ত্র থেকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'মোট কথা, নিশ্চয় স্মরণ রাখবে যে, রসূল (সঃ)-এর কামিল ইত্তেবা ও অনুবর্তিতার সুফলসমূহ কখনও বিনষ্ট হতে পারে না। এটা তাসায়্যুফের স্বীকৃত মসলা,- যদি 'যিল্লি মর্তবা' (-প্রতিবিম্বিত মর্যাদা) না হতো, তাহলে এই উম্মতের ওলী-আল্লাহ্গণ তো মরেই যেতেন।" 'যিল্লি মর্তবা' অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলার রসূল-এর দিক থেকে যে (আত্মিক) প্রতিবিম্বনের বিষয়-বস্তু রয়েছে তা "যদি না হতো তাহলে এ উম্মতের আওলিয়া তো মরেই যেতেন। এই পরিপূর্ণ অনুগমন এবং বুরূযী ও যিল্লি মর্তবা-ই তো ছিল যার দরুন বায়যীদ (বোস্তামী) 'মুহাম্মদ' নামে অভিহিত হয়েছিলেন এবং তা বলাতে সত্তর বার কুফরী ফতোয়া তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়া হলো এবং তাঁকে দেশান্তরিত করা হলো।" বায়যীদ বোস্তামী একথাই বলতেন যে, 'যিল্লি ভাবে (অর্থাৎ আত্মিক প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়ায়) আমি হচ্ছি 'মুহাম্মদ'। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়ে ছিলেন যে, তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রেমে আত্মোবিলীন। সুতরাং বাহ্যদর্শী লোকেরা, যারা তত্ত্ব কথা বুঝতে পারে না তারা তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বসলো। তেমনি, অনেকে যারা নিজেকে খোদা বলতেন তাদেরকে তারা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল। ওরূপ দাবীদারগণ শেষমুহূর্ত অবধি 'আনাল-হক্, আনাল-হক্' বলতে বলতে কাঠগড়ায় উঠে গেলেন।

অতএব, উলামা বা মৌলবীরা প্রত্যেক যুগে যে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে এটা কোন নতুন কথা নয়। সেজন্য আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে আজ বিস্মিত বা উদ্বিগ্ন হবার কোনও প্রয়োজন নেই। যখন থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জামানা গত হয়েছে তারপর থেকে এই সবলোক কেবল ফেৎনা-ই সৃষ্টি করতে থাকে, 'আহ্লে হক্'- সত্যের ধজাধারীদের বিরুদ্ধেই ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলীতে যেখানে যেখানে তিনি নিজেকে 'মুহাম্মদ' বলেছেন অথবা এই শ্রেণীর যে সব লেখা রয়েছে সেগুলোই মৌলবীরা বেশী ফলাও করে। পূর্ববর্তীদের সাথেও তারা এ একই ব্যবহার করে এসেছে। সেজন্য এতটুকুও উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্তাআলা পরিশেষে তাদের বিষয়ে নিষ্পত্তি করবেন, চূড়ান্ত ফয়সালা দেবেন এবং একটি সময় এরূপ আসবে যখন দুনিয়া তা তাকিয়ে দেখবে, ইনশাল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আক্ষেপ! তারা যদি এই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে পরিচিত হতো তাহলে তারা জানতে পারতো যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর মর্যাদা ও প্রকৃত স্বরূপকে এই লোকেরা বোঝে-ই নি, অনুধাবনই করতে পারে নি। যদি আঁ হযরত (সঃ)-এর পায়রবী ও অনুসরণের প্রভাব ও সুফল সমূহ-ই অব্যাহত না থাকে তাহলে তো আঁ হযরত (সঃ)-এর আত্মিক জীবনের প্রমাণই বা কী থাকে..... যখন কিনা এর ফলাফল ও কল্যাণসমূহ আমরা পেতে না পারি? আমি সত্যসত্য বলছি যে, এটা এক বাজে ও কুফরী ধারণা বৈ কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুবর্তিতার (আত্মিক) সুফলসমূহ এখনও এবং সদাসর্বদা লাভ করা যেতে পারে। আল্লাহ্তাআলার সত্তায় কার্পণ্য নেই। এবং তাঁর কাছে কোনও কিছুর অভাবও নেই।" (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, নবসংস্করন, পৃঃ ৪০৬)। অতঃপর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁর প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে প্রিয় বানিয়ে দেয়। তা এইভাবে হয় যে, সেরূপ অবস্থায় তার হৃদয়ে খোদাপ্রেমের একটি দহন সৃষ্টি হয়। তখন ওরূপ ব্যক্তি সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে খোদার দিকে ঝুঁকে যায় এবং তার অনুরাগ ও অভিলাষ কেবল আল্লাহ্র সাথে অবশিষ্ট থেকে যায়, তখন তার ওপর খোদাপ্রেমের একটি বিশেষ আলোকসম্পাত হয় এবং খোদা তাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রঙ দিয়ে প্রবল আবেগ সহকারে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের ওপর জয় লাভ করে এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক থেকে খোদাতাআলার অলৌকিক 'খারেক আদৎ' অর্থাৎ দুনিয়াদার (সংসারী) সাধারণ লোকদের সাথে যে ধারায় ব্যবহার হয়ে থাকে তা ব্যতীত এক অসাধারণ ব্যবহার তার বেলায় করা হয়। অতএব, "খোদাতাআলার 'খারেক আদৎ' বা অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়" (হাকীকাতুল ওহী রুহাণী খাযায়েন, খন্ড-২২,পৃঃ ৬৭-৬৮)।

এখন, পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ উদ্ধৃতিটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই অনেকগুলি উদ্ধৃতি ছেড়ে দিয়েছি এজন্যে যে, আজ জুমুআর নামাযের পরে যেমন আগেই আমি বলেছি, তিনটি বিয়ের এলানও করতে হবে।

হযরত (আঃ) বলেন, "আমি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর উপর হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম) কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী। তাঁর উচ্চ মর্যাদার সীমা-পরিসীমা সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয়। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোসের বিষয়, যেভাবে সনাক্ত করা উচিত তাঁর মর্যাদাকে সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তৌহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তিনিই একমাত্র মহাবীর তা পুনরায় দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন। তিনি খোদাকে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছেন এবং আদম-সন্তানের জন্যে চূড়ান্ত সহানুভূতিতে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই জন্যে খোদা, যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন তিনি তাঁকে সকল নবীর–পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করেছেন। ইনিই তিনি, যিনি প্রত্যেক কল্যাণের উৎস। যে-ব্যক্তি তাঁর কল্যাণরাজীকে স্বীকার না করে কোনও মর্যাদালাভের দাবী করে সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রত্যেক মর্যাদার চাবিকাঠি তাঁকেই দান করা হয়েছে" (হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, লন্ডনে মুদ্রিত, পৃঃ ১১৮, ১১৯)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

আহমদী শহীদগণের স্মরণে

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত খুত্‌বা জুমুআ, ১৪মে, ১৯৯৯ইং জার্মানী]

আহমদীয়ত খোদার হাতের রোপিত চারা এবং এটি কখনও বিফল হতে পারে না।

কেন্দ্রের হেফাযতের ব্যাপারে কাদিয়ান এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংঘটিত শাহাদত এর স্মৃতিচারণ।

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস ব্যতীত আপনারা এমন নির্ভীক শাহাদত এবং কুরবানীর ঘটনা অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না।

হুযূর (আইঃ) তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর পবিত্র কুরআনের সূরাতুল বাক্বারার ১৫৪ ও ১৫৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছে, হে সেসব লোক যারা ঈমান এনেছ, ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে ধৈর্য এবং নামাযের জন্য দোয়া কর। এ দু'টি বিষয় এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ধৈর্যের মাধ্যমে খোদাতালার নিকট প্রার্থনা কর এবং নামাযের মাধ্যমে খোদতাআলার সাহায্য প্রার্থনা কর। ধৈর্যের মাধ্যমে ধৈর্যের সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নামাযের মাধ্যমে নামাযেরও সাহায্য প্রার্থনা কর। "ইন্নাল্লাহা মা আ'সাসবিরীন" নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন, "ওয়ালা তাকুলু লি মাইঁইুকতালু কি সবিলিল্লাহি আমওয়াত" অর্থাৎ যারা খোদার রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে, খোদার রাস্তায় মারা হয় তাদেরকে মৃত বল না। "বাল আহ্‌ইয়া'উ ওয়ালাকিল্ লাতাশউরুন" অর্থাৎ, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝ না।

এ আয়াতগুলির অর্থ থেকে প্রমাণিত যে, এগুলি শহীদদের স্মৃতিচারণের বিষয় হিসাবে অবলম্বন করা হয়েছে। আমরা যেভাবে শহীদের বর্ণনার এক ধারাবাহিকতা শুরু করেছি আজও ইনশাআল্লাহ্ সে ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কাদিয়ান থেকে হিজরতের পূর্বে যে শাহাদতগুলি হয়েছিল সেগুলির স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে। কেন্দ্রের হেফাযাতের ব্যাপারে কাদিয়ান এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যে শাহাদতগুলি হয়েছিল তাদের সম্পর্কে গত খুত্‌বায় আমি বলেছিলাম যে, তাদের বৈশিষ্ট্য দ্বিগুণ, কেননা, তারা সেই সকল মুসলমান যাদের দোষ কেবল এটিই ছিল যে, তারা মুসলমান। এজন্য তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছিল। আহমদীরা মুসলমানদের হেফাযতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ

করেছিল। এগুলি অসাধারণ মর্যাদার শাহাদত ছিল। আপনারা আশ্চর্য হবেন যে, তারা কত সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল এবং খোদার রাস্তায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। পরবর্তীতে তাদের বর্ণনা আসছে।

প্রথম স্মৃতিচারণ ঃ- শহীদ জমাদার মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব। তাঁর শাহাদতের তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ইং। আমি দুঃখিত যে, আমাদের ইতিহাসে এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা একত্রিত করা হয় নি। তবে এখন শহীদের যে বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে এর ফলে অনেক শহীদের উত্তরসূরী নিজেরা সেই বিবরণ পাঠাচ্ছে যা আমাদের ইতিহাসে সংরক্ষিত নেই। তারা লিখছে যে, 'আমরা তাঁদের (শহীদের) কতজন সন্তান ছিলাম, কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছি, আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সঙ্গে কি আচরণ করেছেন এবং শত্রুদের সঙ্গে কি আচরণ করেছেন ইত্যাদি। বস্তুতঃ শাহাদতের এই বরকতপূর্ণ বর্ণনার ফলশ্রুতিতে অন্য আরেকটি বিবরণ একত্রিত হওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, যার প্রেক্ষিতে আমাদের ইতিহাসকে আরোও ব্যাপক ও সমৃদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে।

জমাদার মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব সম্পর্কে আহমদীয়তের ইতিহাসে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ)-এর ডায়েরীর উদ্ধৃতিতে ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ইং সনে এই লেখা হয়েছে যে, মুসলমানদের একটি বড় গ্রাম ছিল সাঠিয়ালী। ঐ এলাকার মুসলমান এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রামের মুসলমান সেখানে একত্রিত ছিল। সেই গ্রামের মুসলমান এবং আশে পাশের গ্রামের মুসলমানগণ আশ্রয়ের জন্য একত্রিত হওয়া অবস্থায় সেখানে শিখদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। সেই আক্রমণের সময় মুসলমানদের হেফাযতের জন্য জামাদার মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবকে সাঠিয়ালীতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেখানে 'ব্রেইন' গানের গুলিতে শহীদ হন। শহীদ জামাদার সাহেব আহমদীয়া, কোম্পানী ৮/১৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট থেকে জানুয়ারী, ১৯৭৪ইং সনে অবসর পেয়েছিলেন। ২৫ আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং সনে কেন্দ্রের হেফাযতের জন্য কাদিয়ানে চলে আসেন এবং জনাব ক্যাপ্টেন শেরওয়ালী সাহেবের নির্দেশে সুবেদার আব্দুল মান্নান সাহেব দেহলভী, আব্দুস সালাম সাহেব সিয়ালকোটী, হাওয়ালদার মেজর মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব গুজরাতী, মুহাম্মদ ইকবাল সাহেব, আব্দুল কাদের সাহেব খারেওয়ালে, গোলাম রসূল সাহেব সিয়ালকোটী, ফযল আহমদ সাহেব এবং আব্দুল গাফফার সাহেবের সঙ্গে সাঠিয়ালী যান। সেখানে শিখরা রাইফেল, ষ্টেনগান, ব্রেইনগান এবং গ্রেনেড নির্বিঘ্নে ব্যবহার করে। জামাদার মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব, সুবেদার আব্দুল মান্নান সাহেব দেহলভী এবং মাহমুদ আহমদ আরেফ সাহেব তিনজন অত্যন্ত বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে তাদের মোকাবিলা

করছিলেন। হঠাৎ ব্রেইন গানের ব্রাষ্ট জামাদার মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবের মাথায় লাগে। আর তিনি ঘটনা স্থলেই শহীদ হন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।

দ্বিতীয় শাহাদত ঃ - যার বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন **মিঞা আলম দীন**। শাহাদতের তারিখ ৬ সেপ্টম্বর, ১৯৭৪ইং সন। তার জন্ম সম্ভবতঃ ১৮৫৮ইং সনে। তিনি কাদিয়ানের নিকট নাংগালবাগানে কিছুকাল বসবাস করেন। অতঃপর ১৯৩২ইং সনে কাদিয়ানে চলে আসেন। প্রথমে মসজিদ মুবারক হালকায়, তারপর মসজিদ ফযল হালকায় অবস্থান করেন। তবলীগে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এতদুদ্দেশ্য প্রত্যেক বৎসর গরমের সময় 'বিপাসা' নদীর নিকট নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতে যেতেন। তাঁর তবলীগে তাদের মধ্য থেকে কতক আহমদীয়ত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি মাওলানা জালালুদ্দীন কমর সাহেবের পিতা ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ অমুসলিম দলগুলি পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সাহায্যে যখন কাদিয়ান আক্রমণ আরম্ভ করে তখন সেনাবাহিনী কাদিয়ানে কারফিউ জারী করে দিয়েছিল। কাদিয়ানের অধিবাসীদের নিয়মের শিকলে আবদ্ধ রেখে অমুসলমান দলগুলিকে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে ছেড়ে দিয়েছিল। তথাপি অমুসলিম দলগুলির আহমদীদের মোকাবিলা করার সাহস ছিল না। আল্লাহ্‌তাআলার কিছু ওয়াদা তো এমন ছিল যে, এ জামাতকে প্রতাপের মাধ্যমে সাহায্য করা হবে। প্রকৃত কারণ এটিই, যা আমরা বার বার পূর্ণ হতে দেখেছি। এ সাহায্যের মধ্যে অন্যদের মিথ্যাও শামিল হয়ে যেত, যা তাদের বিরুদ্ধে কাজ করত। তারা এত ব্যাপকভাবে কাদিয়ানের অস্ত্র সম্পর্কে প্রচার করে রেখেছিল যে, শিখদের দল সেনাবাহিনী এবং পুলিশের সাহায্য লাভ সত্ত্বেও যখন যুদ্ধ করত আর সামান্যতম ভয় হত যে, কাদিয়ান থেকে অস্ত্র বের করে হয়ত তাদের উপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ হতে যাচ্ছে তখন ভয়ে তাঁরা পালিয়ে যেত। তথাপি সেই সময় যখন যুদ্ধ চলত তখন তারা কতক আহমদী এবং অ-আহমদী মুসলমানকে শহীদ করার নিশ্চিত সুযোগ পেয়ে যেত।

যে ঘটনা আমি বর্ণনা করছি তা সম্ভবতঃ কাদিয়ানের উপর একটি বড় আক্রমণ যা ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ইং সনে সংঘটিত হয়েছিল। সেই আক্রমণের ব্যাপকতা মসজিদ ফযলের হালকায় বেশী ছিল। মহিলা এবং শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ যেসব আহমদী স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে সেবায় নিয়োজিত ছিলেন তারা প্রত্যেক ধরনের বিপদ সহ্য করে সকল মহিলা এবং শিশুদের সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। মাওলানা জালালুদ্দীন কমর সাহেব বর্ণনা করেন যে, 'আমার শ্রদ্ধেয় পিতা নিজের ঘরের বালাখানায় বসা ছিলেন। সেই ঘরের সামনে কাঁচা একতলা বাড়ীঘর ছিল। একজন শিখ পুলিশ ঐ ঘরগুলির ছাদের উপর উঠে এসেছিল। বালাখানার জানালাও সেইদিকে খুলত। সেই আইন রক্ষকের দৃষ্টি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার দিকে পড়ে। আমার পিতা সম্ভবতঃ নিজের বিভিন্ন চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আর তাঁর দৃষ্টি পুলিশের উপর পড়েনি। সেই পুলিশটি হঠাৎ গুলি চালায় আর তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)। তাঁর শাহাদতের দৃশ্য অন্য বালাখানায় বসা এক আহমদী বন্ধু প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাদের মধ্যে চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং 'নেযামতে জায়দাদ'-এর ক্লার্কও ছিলেন। সেখানে অবস্থিত আহমদীগণ জানাযার নামায পড়ে পরিহিত কাপড়েই তাঁকে দাফন করেন।

প্রসঙ্গতঃ আমি এ ব্যাপারে বর্ণনা করতে চাই যে, যে ব্যক্তিগণ বড় ভয়ানক বিপদ সত্ত্বেও নিজেদের ঘরে বসেছিলেন তাঁরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশের প্রেক্ষিত বসেছিলেন। এ কারণে তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই অপবাদ অপনোদনের জন্য (নিজের ঘরে বসেছিলেন) যে, কাদিয়ানের অধিবাসীরা নিজেদের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে বড় ঝামেলা কাদিয়ানের উপর আসতে পারত। এ ভয়কে দূরীভূত করার জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন প্রত্যেক আহমদী নিজের ঘর পাহারা দেয়। কেবল তারাই নিজেদের ঘর থেকে বাইরে যাবে যাদেরকে জামাতের নেযাম কোন উদ্দেশ্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিবে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুরা অন্তর্ভুক্ত থাকত। এ কারণে ঐ (পুরুষদের) ব্যক্তিদের এক একা নিজের ঘরে বসে থাকা নিশ্চিত একটি অতি মহান শাহাদত ছিল। কেননা, তাঁরা জামাতের মর্যাদার জন্য নিজেদের প্রাণের ভয় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আর একজন বুযর্গ **সৈয়্যদ মাহবুব আলম সাহেব বিহারী**। **শাহাদতের ঘটনাঃ** তাঁর শাহাদতের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ইং সন। সৈয়্যদ মাহবুব আলম সাহেব বিহারীর পরিবার পরিজন বর্তমান যুক্তরাজ্য এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আছে। তবে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যেই তাঁর সন্তানরা বসবাস করছেন। সৈয়্যদ সাহেব একজন নেক এবং অত্যন্ত ত্যাগী বুযর্গ ছিলেন। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ইং সনে ভোরের নামাযের পর প্রাতঃভ্রমণের জন্য রেল লাইনে যান। সাহসিকতা লক্ষ্য করুন, পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ ছিল, ঘরে বসে থাকার নির্দেশ ছিল, তথাপি ভীরুতার সঙ্গে অবস্থান করেন নি। প্রাতঃভ্রমণের যে অভ্যাস ছিল সেটি জারী রেখেছিলেন। নিয়ম মাফিক প্রাতঃভ্রমণের জন্য রেল লাইনে যেতেন। রামপুর মৌজা অধীনস্থ কাদিয়ানের ডি, বি, স্কুলের কাছে কেউ তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। প্রথমে তাঁকে নিখোঁজ ভাবা হচ্ছিল, যে সকল আহমদী স্বেচ্ছাসেবক দল ঘরে ঘরে যেতেন তারা তাঁর ঘরে তাঁকে না পেয়ে এটিই মনে করতে থাকেন যে, তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন। সম্ভবতঃ অন্য কারো ঘরে চলে গেছেন। এই ঘটনার তিনদিন পর এক গ্রাম্য মুসলমান, যে আশ্রয়ের জন্য বাইর থেকে এসেছিলেন, সৈয়্যদ সাহেবের জামাতা সৈয়্যদ সাদেক হোসেন সাহেবকে বলে যে, আমি এ চেহারায় নীল কাপড় পরিহিত একজন মুসলমানের লাশ রেল লাইনের কাছে পড়ে থাকতে দেখছি। আর এই নীল কাপড় পড়া তিনিই ছিলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলয়হি রাজিউন)। সুতরাং তিনদিন পরে তাঁর লাশের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁকে দাফন করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

শামসা সফীর সাহেবা লন্ডন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমার নান জান সৈয়্যদ মাহবুব আলম সাহেব এবং তাঁর ভাই সৈয়্যদ মাহমুদ আলম সাহেব যখন আহমদীয়তের সংবাদ পান তখন বিহার থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান এসেছিলেন। এ ঘটনাটির পূর্ণ তদন্ত আমি যুক্তরাজ্য থেকেই করিয়েছি। জামাতের ইতিহাস যতটুকু সংরক্ষিত আছে, আমি সেই আসল রেজিষ্টার পাঠ করেছি। যেখানে আহমদীয়তের প্রারম্ভিক সাহাবাদের মহান ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁরা কত অসাধারণ কুরবানীর দৃষ্টান্ত রেখে কাদিয়ানে

এসে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হাত বয়াত হয়েছেন। আমার এটি ধারণা ছিল যে, সৈয়্যদ মাহবুব আলম সাহেব সম্ভবতঃ তাদের মধ্য থেকেই হবেন। সুতরাং যুক্তরাজ্য থেকে সত্যায়ন করা হ'ল। শামসা সফীর সাহেবা এই সত্যায়ন পাঠালেন যে, শহীদের বংশধরের মধ্যে কেবল এক মেয়েই ছিলেন যিনি আমার মা। তাঁর নাম সালমা ছিল। ১৫ বছর বয়সে সৈয়্যদ সাদেক আলী সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

পায়ে হেঁটে কাদিয়ান আসা সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাঁরা বিহারে আহমদীয়তের সংবাদ পেয়ে সেখানে থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান আসেন। তাঁদের পা ফুলে গিয়েছিল, দরিদ্র পরিবার ছিল, তাই সফরের খরচ ছিল না, এই সংক্ষিপ্ত কথা লিখেছেন। যে রেজিষ্টারের উদ্ধৃতি আমি দিচ্ছি সেটির বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ জলসা সালানাতে শুনাবো। অত্যন্ত মহান মর্যাদার ঘটনা। আশ্চর্যজনক কুরবানী! খালি পায়ে বিহার থেকে রেল লাইনের পাশাপাশি হাটায় ক্ষত-বিক্ষত পা প্রতিদিন ফুলে যেত। তা সত্ত্বেও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সংবাদ শুনে কেবল চোখে দেখার জন্য এই অবস্থায় কাদিয়ান এসেছিলেন। সুতরাং তাঁর শাহাদত একটি মহান ঘটনা যা কখনও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পূর্বে যেমন বীর ছিলেন শাহাদতের সময়ও তেমন বীরই প্রমাণিত হয়েছেন।

মোকাররম সুলতান আলম সাহেবের শাহাদত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সুলতান আলম সাহেব ২৬ নভেম্বর, ১৯২২ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ইং সনে কাদিয়ানের তা'লীমুল ইসলাম হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। সেই সময় তাহরীকে জাদীদ বোডিং হাউজে ছিলেন। সেই ছোট কাল থেকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এর পর গুজরাট থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ, এ পাশ করেন। তারপর সি, এম, এ, প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরী আরম্ভ করেন। ১৯৪২ইং সনে ওসীয়্যত করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশে নিজের সম্পত্তি ওয়াকফ্ করেন। ১৯৪৭ইং সনের জুন মাসে মেহ্মান খানায় নাযের যিয়াফতের সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। যেহেতু তিনি ওয়াকফে পরে এসেছিলেন আর কাদিয়ানের নাযের যিয়াফতের সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেজন্য অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে কর্তব্য পালন করেছেন। ১৯৪৭ইং সনের এক ছুটিতে ২৫ সেপ্টেম্বর 'গোলেকি' পৌঁছেন। মরহুম এটি লিখেছেন, 'হুযূরের নির্দেশ হয়েছে যে, মহিলা এবং শিশুদের পাঠিয়ে দাও। আর দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা কর। আমরা হুযূরের নির্দেশে রক্তের শেষ বিন্দু ঝরানোর জন্য এখানে বসে আছি।'

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৪৭ইং সনের ১৪ অক্টোবর কারফিউ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন মহল্লায় বসবাসকারী আহমদী নিজেদের ঘর দেখা শুনার জন্য বাইরে আসছিলেন। তখন বড় বাজারের শেষ প্রান্তে 'রেতিছল্লার' সাথে সংযুক্ত অংশে প্রকাশ্য দিবালোকে খোলা বাজারে ৭জন আহমদীকে গুলির নিশানায় আনা হয়। তাদের মধ্যে সুলতান আলম বি, এ, নায়েব নাযের যিয়াফতও ছিলেন। আহমদী শহীদের লাশ উঠানোর জন্য কতক ব্যক্তি যখন সামনে অগ্রসর হয় তখন তাদেরকেও গুলির লক্ষ্যে পরিণত করা হয়।

এখন আমি শহীদের আরোও পরিচয় বর্ণনা করছি। এই শহীদ ওয়াকফে জিন্দেগী মোকাররম পীর আলম সাহেবের আপন ভাই ছিলেন। পীর আলম সাহেব সব সময় আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। রাত ১২টা বা ১টা পর্যন্ত আমাদের কতক 'ইলমি মজলিস' (শিক্ষা মূলক আলোচনা) চলত। অনেক সময় ২টা পর্যন্ত হত। সবাই বিদায় নিয়ে চলে যেত কিন্তু পীর সাহেব কখনও বিদায় নিতেন না। সকালে আমি আমার অফিসে অন্যান্য কর্মচারীদের আসার পূর্বেই এসে যাই। তথাপি কখনও এমন হয়নি যে, আমি পৌঁছে গেছি কিন্তু পীর সাহেব উপস্থিত হন নাই। আল্লাহ্তাআলার ফযলে তাঁর ভাইতো শাহাদতের সম্মান লাভ করেছেন। আর পীর সাহেবও জীবদ্দশায় ওয়াকফের দায়িত্ব পূর্ণ করে আল্লাহ্র সমীপে নিশ্চিতভাবে মহান মর্যাদা লাভ করেছেন।

নূর হাসপাতালে কাছে যে গর্তে তাকে দাফন করা হয়েছিল এখন সেখানে নাম ফলকও লাগানো হয়েছে। এই শহীদের পর যতজন শহীদ হওয়ার তৌফীক পেয়েছিলেন তাদেরকে নূর হাসপাতালের কাছে একত্রে এক গর্তে দাফন করা হয়েছিল। সেখানে এখন আল্লাহ্তআলার ফযলে নাম ফলক লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি একথাগুলি এ জন্য বলছি যেন কাদিয়ান গমনকারীগণ সেখানে গিয়ে দোয়া করেন। শহীদ বৃদ্ধ মা-বাবা ছাড়াও গুজরাতের অধিবাসী ডাঃ ওমর দীন আফ্রিকী সাহেব এর যুবতী মেয়েকে বিধবাস্বরূপ এবং দুই ছেলে খলীল আহমদ ও নঈম আহমদকে উত্তরসূরী হিসেবে রেখে গেছেন।

এখন আরেকজন **শহীদ মোকাররম মির্যা শফি সাহেবের** শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করছি। শাহাদতের তারিখ ১৪ অক্টোবর, ১৯৪৭ হিং সন। তাঁর ছেলে মির্যা মসীহ আহমদ এখন জার্মানীতে আছেন। আপনারা অনেকে তাঁকে চেনেন। মির্যা আহমদ শফি সাহেব মির্যা মুহাম্মদ শফি সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ১৯১৩ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক নম্বর পেয়ে মেট্রিক পাশ করেন। এফ, এ, এবং বি, এ, তে ডাবল ম্যাথমেট্রিক্স (গণিত) নিয়ে উচ্চ নম্বর পেয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। শাহাদতের সময় তিনি কাদিয়ানের তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুলে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সিলসিলার খেদমত করা নিজের জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছিলেন। বাজামাত নামায এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে মনযোগী ছিলেন। সর্বপ্রকার চাঁদা বিশেষ করে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রতি বছর বর্ধিত হারে পরিশোধ করতেন। নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজ দায়িত্ব অত্যন্ত উত্তমভাবে পালন করেছিলেন।

আমি এখন তাঁর পরিবারের সাথে পরিচয় করাচ্ছি। তাঁর পিতা হযরত মির্যা মুহাম্মদ শফী (রাঃ) সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার 'মোহাসিব' ছিলেন। আমার বাল্যকাল থেকে দেশ বিভক্তি পর্যন্ত সব সময় তাঁকে দেখার কথা স্মরণ আছে। অত্যন্ত কর্মঠ দক্ষ কর্মী ছিলেন। সবসময় উন্নত গুণাবলী প্রদর্শনের মাধ্যমে 'মোহাসিবের' কাজ করেছেন। তাঁর আরও পরিচয় এই যে, তিনি হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের শ্বশুর ছিলেন। তাঁরই কন্যা থেকে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ)-এর সমস্ত বংশ বিস্তার লাভ করে। (এছাড়া) যিনি ২য় স্ত্রী ছিলেন, সবাই তাঁকে 'আচ্ছি আম্মা' বলে ডাকতেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। কিন্তু তিনি সৎ সন্তানদের সাথেও মায়ের মত ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন। বরং কতক সৎ সন্তান তাঁর কোলেই লালিত-পালিত হন। হযরত 'ছোট

আপা' অর্থাৎ - উম্মে মতীনের আপন ভাই ছিলেন মির্যা আহমদ শফি সাহেব। মির্যা আহমদ শফি সাহেবের বিধবা পত্নী আমাতুর রহমান রাবওয়ায় বসবাস করছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে আমাতুল বাসেত সাহেবা থাকেন। তার এক মেয়ে লন্ডনে আছেন। তাঁর সন্তানগণও ধর্মীয় সেবায় তৌফীক পাচ্ছে। ফযল এবং শীলা এই দুই নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জামাতের শিক্ষামূলক খেদমতে পুরাপুরিভাবে অংশগ্রহণ করছে। আমি তাদের দায়িত্বে যে কোন গবেষণার কাজ আর্পণ করি তা তারা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে সম্পন্ন করে। যুক্তরাজ্যের জামাতে এ দু'টি নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি। শহীদের পুত্র মির্যা মসীহ আহমদ জার্মানীতে আছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ বিছানায় শয্যাগত। তবুও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অসুস্থতার মোকাবিলা করছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর অনেক সেবা করছেন। আমি আপনাদের সবাইকে তাদের সবার জন্য দোয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখন কয়েকটি শাহাদতের স্মৃতি চারণ করছি। তারা হচ্ছেন **শহীদ ফয়েয মুহাম্মদ সাহেব, যহুরা বিবি সাহেবা, শহীদ আব্দুল জব্বার সাহেব এবং শহীদ ফয়েয মুহাম্মদ সাহেবের ৪ বছরের মেয়ে**। ঠিকাদার মোকাররম আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বর্ণনা করছেন যে, 'ফয়েয মুহাম্মদ সাহেব শ্রী গবীন্দ পূরার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নবী বখ্শ। রাজ মিস্ত্রীর কাজ করতেন। তাঁর শাহাদতের এক রাত পূর্বে কাদিয়ানে ভারতীয় সেনাবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ফায়ারিং করে আর সকালে ফজরের পর শিখ বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। এভাবে ভারতীয় সৈন্য শিখ বাহিনীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করত। অতঃপর এর পিছনে তারা আক্রমণ করত। তিনি বলেন, 'আমরা সেখান থেকে হিজরত করে বোডিং এ চলে গিয়েছিলাম কিন্তু ফয়েয মুহাম্মদ সাহেব এবং তাঁর পরিবার নিজেদের ঘর না ছেড়ে সেখানেই থেকে যান।'

এখানেও সেই রূপই, যেহেতু ইমামের নির্দেশ ছিল নিজের ঘরে অবস্থান নেয়ার তাই তাঁরা আক্রমণের নিশ্চিত সংবাদ পেয়েও খোদাতাআলার ফযলে নিজেদের ঘরে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেন। 'যে সময় আমাদের ঘরে আক্রমণ হয় তখন আমরা প্রায় ১০০ জন ঘরের পিছন দরজা দিয়ে বোডিং চলে গিয়েছিলাম।' অর্থাৎ ঠিকাদার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এ বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আমরা চলে গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'পন্ডিত আব্দুল্লাহ্ সাহেব সংবাদ দিলেন যে, ফয়েয মুহাম্মদ সাহেব, তাঁর স্ত্রী যহুরা বিবি সাহেবা, তাঁদের যুবক ছেলে আব্দুল জব্বার সাহেব এবং ৪ বছরের মেয়েকে শিখরা তরবারি এবং বর্শা দিয়ে শহীদ করে ফেলেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।

শহীদ মালেক হামেদ আলী সাহেব নামক একজনের শাহাদত বর্ণিত রয়েছে। ইতিহাসে তাঁর নাম আছে কিন্তু বিস্তারিত কিছু লিপিবদ্ধ নেই। এ খুত্বার মাধ্যমে একটি উপকার এই হচ্ছে এবং হবে যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা শুনবে তাঁরা ইনশাআল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করবেন। মালেক হামেদ সাহেব সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে তা হচ্ছে তিনি মোকাররম মালেক বশীর আহমদ সাহেব কুঞ্জাহী-এর ছেলে এবং জনাব মালেক গোলাম ফরীদ সাহেব (রহঃ) এম, এ, এর সম্পর্কে ভাতিজা ছিলেন। শহীদকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়ে কাদিয়ান হাই স্কুলের পিছনে গুলি করে মেরে শহীদ করে দেয়।

মাষ্টার আব্দুল আযীয নামক একজন শহীদ। তাঁর সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি তবে সংক্ষিপ্ত যা জানা গেছে তা আমি বর্ণনা করে দিচ্ছি। শহীদ কাদিয়ান সংলগ্ন 'নাঙ্গাল বাগানের' অধিবাসী ছিলেন। লাহোর থেকে ফিরত আসছিলেন, কাদিয়ানে পৌছতে পারেন নি (রাস্তাতেই) তাঁকে শহীদ করা হয়েছে। তিনি এ উদ্দেশ্যে লাহোর থেকে ফিরত আসছিলেন যে, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর নির্দেশ ছিল কাদিয়ানের অধিবাসীরা যেন কাদিয়ান না ছাড়ে। এজন্য তিনি বাইরে সুরক্ষিত স্থানে পৌছা সত্ত্বেও কাদিয়ানে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর সর্ম্পকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি যে, তিনি কীভাবে শহীদ হয়েছেন? কিছু কাল যাবৎ নিখোঁজ থাকার কারণে এই বর্ণনা করা হয় যে, তাঁকে বাটালায় শহীদ করা হয়েছে। শহীদ মাষ্টার আব্দুল আযীয সাহেব কোন সময় মাদ্রাসা আহমদীয়ার শিক্ষকও ছিলেন।

এখন এমন দু'জন শহীদের বর্ণনা করছি যাদের কথা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাঁর "কাদিয়ান কি খুন রেযজং" (কাদিয়ানের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ) প্রবন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, 'কাদিয়ানের কেন্দ্রীয় অংশে যে আক্রমণ হয়েছিল তাতে একটি অদ্ভুত ঘটনা রয়েছে।' অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাকে বিশেষ করে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কেন অদ্ভুত ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন? তার কারণ হচ্ছে এটি প্রাথমিক যুগের কুরবানীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। 'পুলিশ এবং শিখরা শহরের ভিতরে প্রবেশ করে যখন শহরের পশ্চিমাংশের লোকজনকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল তখন লোকজন পূর্বাংশে চলে আসল। পরে জানা গেল গলির অপর প্রান্তে একটি ঘরে চল্লিশজন মহিলা একত্রিত ছিল তারা সেখানেই রয়ে গেছে।' আমাদের কাদিয়ানের পশ্চিমে হিন্দু মহল্লা ছিল। আর প্রথমে আহ্মদীরাও সেখানে বসবাস করত। যখন এই বিপদ আসল তখন আহমদীদের কোনভাবেই নিরাপদ জায়গায় পৌছানের সময় পাওয়া যায় নি। তারা সেখানেই বিভিন্ন ঘরে সমবেত হয়েছিল। সামর্থ্যানুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে নিয়ে আসত। এই হ'ল প্রেক্ষাপট যাতে ঘটনা ঘটে। অতএব হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) লিখেছেন, 'শহরের পশ্চিমাংশের লোকজনকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল।' অর্থাৎ প্রথমে সৈন্য এবং পুলিশ এ কাজ আরম্ভ করেছিল, পরে স্থানীয় শিখরা এ কাজ জারী রেখেছিল। 'পশ্চিমাংশের লোকজন আহমদীদের পূর্বাংশে চলে আসার পর জানা গেল যে, গলির অপর প্রান্তের এক ঘরে ৪০ জন মহিলা সমবেত হয়েছিল তারা সেখানেই রয়ে গেছে। কতক অফিসার তাদেরকে বের করার জন্য গলির প্রান্তে অবস্থিত ঘরে আসেন। তাদেরকে বের করতে দু'জন যুবককে পাঠান। তখন সেখানে কাঠের টুকরা বসিয়ে একটি সাময়িক সাঁকো বানিয়ে নেয়া হত আর কাঠের টুকরার উপর দিয়ে অতিক্রম করা হত। এই যুবকরা যখন গলি অতিক্রম করছিল তখন সামনের ছাদ থেকে পুলিশ তাদের উপর বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ শুরু করে। তারা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সম্ভবতঃ তখন কাঠের তক্তা আনিয়ে প্রথমে নীচ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু খোলা গলি ছিল এজন্য তারা সেখানে শত্রুর লক্ষ্যস্থলে ছিলেন। তাই ভয় ছিল যে, হয়ত কেউ রক্ষা পাবে না। এজন্য পরবর্তীতে যে পন্থা কারও চিন্তায় আসে তা হচ্ছে, কাঠের টুকরা বিছিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তার উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাওয়া।

একাজের জন্য ২জন যুবক গিয়েছিল। অর্থাৎ ২জন যুবক নিজেদেরকে পেশ করে যে, আমাদেরকে পাঠান আমরা ইনশাআল্লাহ্ কাঠের টুকরার উপর দিয়ে আহমদী মহিলাদেরকে বের করে আনব। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গোলাম মুহাম্মদ সাহেব পিতা মিস্ত্রী গোলাম কাদের সিয়ালকোটী সাহেব। অপর জন ছিলেন কাদিয়ানের আব্দুল খালেক। তিনি তখনও জামাতে দাখিল হন নি। তবে আহমদীয়তের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, আহমদী মুজাহিদদের সঙ্গে খেদমত সম্পূর্ণভাবে অংশ নিচ্ছিলেন। এই ২ যুবক বর্ষণরত গুলির ভিতরে কাঠের টুকরার উপর দিয়ে লাফিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করেন। তারা একজন মহিলাকে কাঁধে করে তক্তার উপর রাখতে শুরু করেন। অপরদিকে পূর্ব পার্শ্বের ঘরের লোকেরা তাদেরকে টেনে নামাতে থাকেন।

তারা নিজেদের ধারাণায় যখন সব মহিলাদের বের করে ফেলেছেন এবং নিজেরা ফিরে এসেছেন আর নিরাপদ হলেন তখন জানা গেল যে, ৩৯ জন মহিলা এসেছে আর ১জন আসে নি। অথচ এটি নিশ্চিত সংবাদ ছিল যে, ৪০ জন মহিলা ছিল। ১ জন বৃদ্ধা মহিলা গুলির ভয়ে এক কোণে লুকিয়ে ছিলেন। তিনি সেখানে রয়ে গেছেন। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ বলতে পারে যে, ৩৯ জন এসেছে তা-ই যথেষ্ট। এক বৃদ্ধার জন্য নিজেদের যুবকদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার কি প্রয়োজন? এমনিতেই তিনি মৃত্যুর সন্নিকটে তাঁকে সেখানেই থাকতে দিন। কিন্তু সে সময় এমন ছিল যে, আহমদী মুজাহিদরা সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরী ছিল। 'তখন সেই দুই যুবক নিজেদেরকে খেদমতের জন্য পেশ করল। গোলাম আহমদ সাহেব পিতা মিয়া গোলাম কাদের সিয়ালকোটী সাহেব এবং তেমনিভাবে আব্দুল হক সাহেব। তাঁরা দুজনে বললেন, চিন্তা করবেন না আমরা যাচ্ছি।

গোলাম মুহাম্মদ সাহেব পিতা মিয়া গোলাম কাদের সাহেব যখন দৌড়ে বৃদ্ধার খোঁজে তার দিকে যাচ্ছিলেন তখন সামনে থেকে তার পেটে গুলি লাগে। অনেক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অন্ত্র বেরিয়ে যায়। তথাপি অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক ছিলেন। তিনি একটি হাত দিয়ে নিজের পেটকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অপর দিকে সেই বৃদ্ধাকে বের করার চেষ্টায় ভিতরে চলে যান। কিন্তু সম্ভব হয় নি এবং সেই কক্ষের অন্য প্রান্তের দরজায় পড়ে যান। এর ফলে অ-আহমদী বন্ধু আব্দুল হক সাহেব বললেন, এখন আমি যাচ্ছি, সে অনুযায়ী তিনি গেলেন। তিনি বৃদ্ধাকে বের করে যখন ফেরৎ আসছিলেন তখন তার পিঠে গুলি লাগে আর তিনিও শহীদ হয়ে যান।

এ দু'টি ঘটনাতেই একটি অদ্ভুত বিষয় লুক্কায়িত আছে। যাতে দোয়ার কবুলিয়ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। আর বুঝা যায়, কীভাবে আল্লাহ্তাআলা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁর বান্দার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূরণ করেন। সেই ঘটনা হল এই যে, চিকিৎসার জন্য তাদেরকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে সাময়িক চিকিৎসা দেয়া হয়। কোন হাসপাতাল ছিল না। এদিকে ক্ষত অনেক বড় ছিল আর চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। এ জন্য তাদের বাঁচার কোন আশা ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সংজ্ঞা ছিল। সে সময় তারা তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য আগতদের বলতেন, 'আমাদের ইসলাম এবং আহমদীয়তের উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা নিজেদের ঈমানের উপর অটুট থেকে মৃত্যু বরণ করছি'। এই ঘটনাগুলিও এমন যা ইসলামের মহান পূরোনো ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিতকারী। সাহাবীগণ মৃত্যুর সময় অন্যদের সাক্ষী রাখতেন, 'সাক্ষী থেকো আমরা এই ধর্মের উপরই আত্ম বিসর্জন দিচ্ছি'।

তারপর তারা আরও একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। শহীদ গোলাম আহমদ বলেছেন, আমি নিজের ঘর থেকে এজন্য বেরিয়েছিলাম যে, আমি ইসলামের জন্য প্রাণ দিব। আপনারা সাক্ষী থাকুন যে, আমি এই উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছি। যখন আমি ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম তখন আমার মা আমাকে নসিহত করেছিলেন যে, বাবা, খেয়াল রেখ যেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন না কর। এই কথায় গভীর তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে যা সম্ভবতঃ এমনিতে চিন্তায় না-ও আসতে পারে। গুলি শহীদের পেটে লেগেছিল। তবে যিনি অ-আহমদী ছিলেন তার গুলি লেগেছিল পিঠে। আল্লাহ্তাআলা এ পার্থক্য করে দেখিয়েছেন যে, মায়ের উপদেশ ও দোয়া ছিল -'মরে যাবে, তবু সামনের দিক থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।' বাস্তবেও তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নি। এটি সেই দিক যা তাঁর শাহাদতকে অত্যন্ত মহান সাব্যস্ত করছে। তিনি তাঁর মায়ের নামে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, আমার মাকে বলো, তোমার ছেলে তোমার ওসীয়্যত পূর্ণ করে দিয়েছে। এ সংবাদ পাঠিয়ে, তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। আহমদীয়তের ইতিহাসে 'কাদিয়ান কি খুন রেয়জং'-এর উদ্বৃতিতে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

এখন **শহীদ মুহাম্মদ রমযান, আলম বিবি, চেরাগ দীন, জান বিবি, মনোয়ার আহমদ** প্রমুখদের শাহাদতের একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। ঠিকাদার ওলী মুহাম্মদ সাহেব যিনি আল্লাহ্তাআলার ফযলে এখনও জীবিত আছেন। তিনি বর্ণনা করছেন, আমার পিতা মোহতরম মুহাম্মদ রমযান সাহেবের পরিবার কাদিয়ানের কাছে 'খারা' মৌজার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পারিবারিক পেশা ছিল কৃষি। প্রথমে তাঁর পরিবার কোন পীরের মুরীদ ছিল। খোদাতাআলার ফযলে ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ ইং সনে সম্পূর্ণ পরিবার আহমদীয়ত গ্রহণ করে। মোকাররম মুহাম্মদ রমযান সাহেব এবং মোকাররম চেরাগ দীন সাহেব উভয় ভাই নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। আমানতের ব্যাপারে এত সুখ্যাত ছিলেন যে, যুদ্ধের সময় যখন পরিস্থিতি খারাপ হ'ল তখন অনেক মানুষ নিজের আমানত মুহাম্মদ রমযান সাহেবের কাছে এনে জমা রাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল এখানে সম্পদ নিরাপদ থাকবে।

হিন্দু ব্যবসায়ী যখন 'খারা' এলাকায় বসতি স্থাপন আরম্ভ করে তখন তারা সরকারের কাছে এ আবেদন করে যে, এই এলাকা তাদেরকে খালি করে দেয়া হোক। শিখ এবং হিন্দুদের চরিত্রে এই পার্থক্য আছে যে, শিখ তরবারীর জোরে নিজেই এলাকা খালি করে নিত। আর হিন্দুদের দাবী ছিল যে, আগে খালি কর পরে আমরা যাব। বনী ইসরাঈলদের কিছু রীতি এখনও জীবিত আছে। যাই হোক তারা সরকারের কাছে আবেদন করে আর সরকার বিশেষভাবে হিন্দুদের ব্যাপক সমর্থন করত যে, 'আগে খালি কর পরে আমরা প্রবেশ করব।' কাদিয়ানে জামাত যখন জানতে পারে যে, বর্তমানে 'খারা'র আহমদীরা কষ্টে আছে তখন কিছু খোদ্দাম বুকে অস্ত্র বেঁধে আমাদের কাছে পৌঁছে। অর্থাৎ ওলী মুহাম্মদ সাহেব এ ঘটনা বর্ণনা করছেন। শিখরা তাদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা করে কিন্তু খোদ্দামরা সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে শিখদের উপর গুলিবর্ষণ করে

যাতে শিখরা গ্রামের একটি অংশ পুরোপুরি খালি করে দেয়। খোদ্দামরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং আহমদীদেরকে বলে আপনারা সূর্য ওঠার পূর্বেই কাদিয়ান চলে আসেন। তাহলে আপনার বাঁচতে পারবেন।

অত্রএব এই উপদেশানুযায়ী ঠিকাদার ওলী মুহাম্মদ সাহেবের গুরুজন ব্যতীত অন্য সব আহমদী সুর্য ওঠার পূর্বে কাদিয়ান চলে যান। কিন্তু ঠিকাদার ওলী মুহাম্মদ সাহেবের গুরুজন এই জায়গা ত্যাগ করার বিপক্ষে অবস্থান নেন। শিখদের ধারণা ছিল, যেহেতু এ পরিবারটি কৃষির জন্য খ্যাত ছিল এ জন্য এখানে অনেক বেশী ধন-সম্পদ থাকবে। শিখদের এই ঘরে আক্রমণের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার ওলী মুহাম্মদ সাহেবের মা আলম বিবি সাহেবা, চাচা চেরাগদীন সাহেব, চাচি জান বিবি সাহেবা চাচার তিন বছরের ছেলে মনোয়ার আহমদ, চাচার এক মেয়ে এবং আত্মীয় সম্পর্কে কাদেরাবাদের মুহাম্মদ শরীককে শহীদ করা হয়। আক্রমণের সময় মুহাম্মদ রমযান সাহেব যদিও তার ৩ বছরের নাতীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন কিন্তু শিখরা তাঁদের পিছু ধাওয়া করে, পুকুরের কাছে গুলি করে শহীদ করে।

এখন আরেক বন্ধু **খাড়িয়াঁর মোকাররম নিয়ায আলী সাহেব** এর শাহাদতের স্মৃতি চারণ করছি। ব্লানভী-এর মোকাররম খাজা গোলাম নবী সাহেব বর্ণনা করছেন যে, আমার এক ছেলে হামিদ আহমদ কেন্দ্রের হেফাযতের দায়িত্ব পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে মহল্লার ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ পায় যে, শিখদের খুব তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য আমাদের ঘরের কাছেই। আমার সংবাদ জানার জন্য ঘরে এসেছিলেন। আমরা নিকটবর্তী মহিলা ও বাচ্চারা চলে গেছে দেখে নিজের ঘর থেকে বের হই এবং মরহুম বাবু আকবর আলী সাহেবের বাড়ীতে পৌছি। সেখানে কেন্দ্রীয় হেফাযতকারী যুবকরা অবস্থান করছিল। আমরা সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর ইনচার্জ সাহেবের কাছে সংবাদ আসে যে, এখনও একটি ঘরে কিছু মহিলা ও শিশু সন্তান বন্দী আছে। বিপদ প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তাদেরকে নিরাপদে বের করে আনার ব্যবস্থা করা হোক। এ প্রেক্ষিতে ইনচার্জ সাহেব যুবকদেরকে ডাকেন তারা দৌড়ে এসে তাঁর আশে-পাশে সমবেত হয়। যখন তাদেরকে বলা হল অমুক ঘরে মহিলা ও শিশু সন্তানরা আছে তাদেরকে বের করে আন। তখন ১৫/২০ জন যুবকের কেউই মুহূর্ত বিলম্ব না করে সৈন্য ও শিখদের গুলি এবং আঘাতের মোকাবিলায় কেবল লাঠি নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় ২০০ জন মহিলা ও শিশুকে নিরাপদে বের করে আনে। এটি (ঐশী) প্রভাব ও সাহায্যের একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। একদিকে সৈন্য, পুলিশ এবং সব রকম অস্ত্র, রাইফেল, কিরিচ ইত্যাদিতে সজ্জিত শিখরা ছিল, তাদের মোকাবেলায় কেবল ১৫/২০ জন লাঠি হাতে, এ সৌভাগ্য লাভ করল যে, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে, তাদের দলকে ভেদ করে, রাস্তা বানিয়ে নিরাপদে মহিলা এবং শিশুদের বের করে নিয়ে আসে। কোন রকম ভয়ের বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

আমাদের মুজাহিদরা যখন তাদেরকে নিজেদের আশ্রয়ে বোডিং এর দিকে নিয়ে আসছিল তখন গ্রাম থেকে কাদিয়ানে প্রবেশের রাস্তার সন্নিকট, মহল্লা 'দারুর রহমত' এবং 'দারুল উলুম'-এর মাঝে অস্ত্রে সজ্জিত অনেক শিখ হামলার চেষ্টা করে। আমাদের যুবক যাদের হাতে লাঠি ছিল, তাদেরকে দৃঢ়-চিত্তে মোকাবিলা করে। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা এই অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পুলিশ ও সৈন্য পৌঁছোয় নি ততক্ষণ পর্যন্ত সেই শিখরা তাদেরকে মারতে সক্ষম হয় নি। এর আগে এই ১৫/২০ জন যুবক কয়েকজন শিখকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল অথচ আমাদের যুবকদের কেউ আহত হয় নি। যেসব মুজাহিদগণ নিজেদের জীবন হাতের মুঠোয় রেখে বীর দর্পে সামনে অগ্রসর হয়েছিল এবং মহিলা ও বাচ্চাদের উদ্ধারে নিয়োজিত ছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন অত্যন্ত নির্ভীক-স্বেচ্ছা সেবক যিনি কাদিয়ানের হেফাযতের জন্য গুজরাত জেলার ঘড়িয়াঁ থেকে এসেছিলেন তাঁর নাম ছিল নিয়ায আলী। তিনি অজ্ঞাতসারে নিজের সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে জানা গেল যে, সৈন্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাকে গুলির লক্ষ্য বানিয়েছিল।

এখন লক্ষ্য করুন যে, এটি খোদাতাআলার কত মহান সাহায্য। ১৫/২০ জন গুলির পরওয়া না করে লাঠি হাতে কোন রাইফেল ছাড়া শিখদের লশ্করের মধ্য দিয়ে পথ করে, সৈন্য এবং পুলিশের সারি ভেদ করে গন্তব্যে পৌঁছে যান। আহমদী মহিলা ও শিশুদের বের করে আনতে সফল হন। সে সময় তারা আহতও হন না। অথচ কয়েকজন শিখ যাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, তাদের লাঠির আঘাতে মারাও যায়। **এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, আহমদীয়ত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর রোপিত বৃক্ষ নয়। এটি খোদার হাতে রোপিত বৃক্ষ, আল্লাহ্‌তাআলা এটিকে তাঁর (আঃ) হাতে রোপণ করিয়েছেন। এ বৃক্ষ কখনও ধ্বংস হতে পারে না। এটি অবশ্যই বৃদ্ধি লাভ করবে এবং সর্বদা উন্নতি করতে থাকবে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগে এটিকে আলোকিত করা হচ্ছে। শত্রুর ফুৎকার কখনও দেদীপ্যমান আলোকে নেভাতে পারবে না।**

এখন **আব্দুল মজীদ খান সাহেব** নামক শহীদের স্মৃতিচারণ করতে চাচ্ছি। তিনি মরহুম প্রফেসর ডাঃ নাসীর আহমদ খান সাহেবের মামা ছিলেন। তিনি কাদিয়ানের মসজিদে আকসায় কুরআন করীমের ক্লাস নিতেন। মরহুম দেশ বিভক্তির পর পুনরায় কাদিয়ান এসে ছিলেন। তিনি সে সময় পাকিস্তান সেনা-বাহিনীতে চাকুরী রত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা মাতাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, মানুষ তাঁকে নিষেধ করা সত্ত্বেও (সৈনিকের) পোষাক পরে সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। তাঁর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি এসে সংবাদ ছিল, অমুক জায়গায় একজন যুবকের মাথা পড়ে আছে। যখন অনুসন্ধান করা হ'ল, তখন জানা গেল সেটি আব্দুল মজীদ সাহেবের মাথা ছিল। যাকে 'খারা' থেকে বাইরে যেতেই শহীদ করা হয়েছিল।

মোকাররম বদর দীন সাহেব, তাঁর স্ত্রী গোলাপ বিবি সাহেবা এবং তাদের ছেলে মুহাম্মদ ইসমাঈল-এর শাহাদতের ঘটনাঃ মোকাররম বদরদীন সাহেব কাদিয়ানের নিকটবর্তী গ্রাম 'সিখোয়ার' অধিবাসী ছিলেন। জন্মগত আহমদী ছিলেন। নিয়মিত প্রত্যেক জুমুআ পায়ে হেঁটে কাদিয়ান এসে আদায় করতেন। তাঁর স্ত্রী গোলাপ বিবি সাহেবাও জন্মগত আহমদী ছিলেন। তিনি আহমদীয়তের জন্য সমস্ত কষ্ট সহ্য করতেন। তাঁর ছেলে মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবও পিতা মাতার

তরবীয়তে পুণ্যবান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। অত্যন্ত নেক মানুষ ছিলেন। তিনিও প্রত্যেক জুমুআয় কাদিয়ান আসতেন এবং কেন্দ্রের হেফাযতের দায়িত্ব অত্যন্ত আনন্দের সাথে পালন করতেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ দেশ বিভক্তির ঘোষণার পর গ্রামের অধিকাংশ আহমদী কাদিয়ানে স্থানান্তরিতে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও সবাই গ্রাম পুরাপুরিভাবে পরিত্যাগ করে নি। হঠাৎ শিখরা গ্রামের উপর আক্রমণ শুরু করে। মুসলমানদের ঘরগুলি দখল করে নেয় এবং তাদেরকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে। মোকাররম ইব্রাহীম সাহেব বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বদরদীন সাহেব, মা গোলাপ বিবি সাহেবা এবং ভাই ইসমাইল সাহেব গ্রাম থেকে এক কাফেলার সাথে আসছিলেন। কাফেলার উপর শিখরা আক্রমণ শুরু করে দেয়। আমি নিজে সেই কাফেলায় ছিলাম। সেখানে আমার বাবা, মা এবং ভাই ইসমাইলকে শহীদ করে দেয়া হয়। আক্রমণের সময় আমার পিতা আমাকে ইশারা করেন, 'পালিয়ে যাও।' অর্থাৎ তিনি তাঁর চলে আসার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি কোন ভীরুতার কারণে চলে আসেন নি বরং পিতার ইতায়াতের জন্য চলে এসেছেন। কেননা, তিনি (শহীদ বদরদীন সাহেব) বুঝে ফেলেছিলেন যে, তাঁর বাঁচা অসম্ভব। সুতরাং সম্ভবতঃ নিজের বংশ অব্যাহত রাখার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তিনি ইশারা করলেন যে, 'চলে যাও।' এ আক্রমণ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে ঐ বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে আসার তৌফীক দান করেন। আর এভাবে তিনি আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে বেঁচে যান। তবে প্রভাব এটি ছিল যে, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন; কোন জ্ঞান ছিল না, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কি হয়েছে ? কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা মরহুম শহীদ পিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী এবং বংশকে অব্যাহতকারী ছিলেন। কতক বন্ধু জানতে পারেন অর্থাৎ অন্যমনস্কভাবে চলা-ফেরা করার সময় কতক আহমদীরা দৃষ্টিতে এসে যান। তারা তাঁকে ধরে কাদিয়ানে নিয়ে আসেন। কিছু সময় পার হওয়ার পর বন্ধুরা তাঁর ইশারা বুঝতে পেরে সেই জায়গায় পৌঁছেন এবং শহীদদের লাশগুলি সেইখানে দাফন করেন।

শেষ স্মৃতিচারণ **শহীদ মোকাররম আব্দুর রহমান সাহেব**। অর্থাৎ দেশ বিভক্তির সময় কাদিয়ানে যত জন শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শেষ জনের স্মৃতি চারণ করছি। এরপর এই বর্ণনা দীর্ঘ এবং অনেক সময় পর্যন্ত চলবে। এখনও তো হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)-এর যুগের শহীদদের বর্ণনা বাকী রয়েছে যা অত্যন্ত মহান। অতঃপর এই অধমের যুগে খোদাতাআলা যাঁদের শহীদ হওয়ার তৌফীক দিয়েছিন তাদের স্মৃতিচারণ করব। অতএব আল্লাহ্‌তাআলা ভাল জানেন যে, এই বর্ণনা কখন পর্যন্ত চলবে। হতে পারে জলসা সালানা পর্যন্ত খুত্‌বার এই ধারাবাহিকতা চলবে।

এর ফলশ্রুতিতে ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা তথ্যসমূহ একত্রিত হবে, এছাড়া বিশেষ করে শহীদদের পরিবারের সকলের হৃদয়ে নিজের পিতামাতার ত্যাগ, আহমদীয়তের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিবে। সম্পর্ক থেকে থাকলে তা আরও গাঢ় করবে এবং **আমি বিশ্বাস রাখি যে, শাহাদতের এই ধারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং আগামী শতাব্দী পর্যন্ত এদের স্মরণে আরও শহীদ সৃষ্টি হতে থাকবে। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, শহীদদের স্মৃতিচারণের এই ধারাবাহিকতা অনেক কল্যাণময় প্রমাণিত হবে।**

ক্যাপ্টেন নূর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, শহীদ আব্দুর রহমান সাহেব 'পীরোশাহ্' এর অধিবাসী ছিলেন। সেনাবাহিনীর হাবিলদার ছিলেন এবং অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। কেন্দ্রের হেফাযতের ব্যাপারে কাদিয়ানে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল। **শাহাদতের ঘটনাঃ** ক্যাপ্টেন সাহেব এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'তলন্তীর' জঙ্গলে কেউ আমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, 'ধুপসড়ির' কুয়াতে আমরা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ফেলে দিয়েছি। তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে আহমদীদের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। কেননা, শত্রুরা রটিয়েছিল যে, আহমদীদের নিকট অগণিত অস্ত্র আছে। বাস্তবে অস্ত্র অত্যন্ত কম ছিল। মুজাহিদগণ একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কেননা, এই রাইফেলের মাধ্যমে অনেক মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব ছিল। ক্যাপ্টেন নূর আলম সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী মোকাররম ক্যাপ্টেন শের আলী সাহেব আমাকে পাঁচ ব্যক্তি সহ পাঠিয়েছিলেন যে, আপনারা রাইফেল খুঁজে নিয়ে আসেন। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি তখন দেখতে পাই কুয়ার সাথে কোন রশি নেই যার মাধ্যমে কুয়াতে নামা যাবে। আমি কোন একটা কিছু খোঁজার চেষ্টা করি এবং কুয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ঝাঁপ দিতেই আমার পিঠে একটি ছোট বর্ষা বিঁধে যায় আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই কিন্তু আমি এর ভ্রুক্ষেপ না করে কুয়াতে ডুব দিই। কুয়াতে কোন রাইফেল ছিল না। একটি ভুল সংবাদ ছিল অথবা কেউ রাইফেল ফেলতে দেখেছিল আর তাঁদের সেখানে পৌঁছার পূর্বে বের করে নিয়েছে। কেবল তিন চারটি ছোট বর্ষা ছিল যার মধ্য থেকে একটি বর্ষা তাঁকে আহত করেছিল। ফেরার পথে রাজনপুরের নিকট আমরা কতক শিখকে বের হতে দেখি। আমরা তাদের পরোয়া না করে সম্মুখে অগ্রসর হই কিন্তু হাবিলদার আব্দুর রহমান সাহেব পেছনেই রয়ে গিয়েছিলেন। শিখরা তা দেখে দৌড়ে আসল এবং ঘটনা স্থলেই আব্দুর রহমান সাহেবকে শহীদ করে দিল। যখন তলন্তির জঙ্গলে আমরা পৌঁছি তখন আমরা এ ঘটনার সংবাদ পাই। পেছন থেকে আগমনকারী এক ব্যক্তি আমাদেরকে বললো যে, শিখরা আব্দুর রহমানকে মেরে লাশ ছাইয়ের স্তুপে ফেলে দিয়েছে অর্থাৎ আখের ক্ষেতে। আমরা সেখান থেকে ঘটনাস্থলে ফেরত যাই আর আব্দুর রহমানের লাশ হেফাযতের সাথে নিয়ে আমি। এই অনুপ্রেরণাই সেই যুগে অব্যাহত ছিল। মুজাহিদরা অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। বাস্তবে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ইতিহাস ছাড়া এ ধরনের নির্ভীক শাহাদত ও ত্যাগের ঘটনা আপনারা খুঁজে পাবেন না।

আমি আশা রাখি আপনারা এ ঘটনাগুলির স্মরণকে সব সময় নিজের হৃদয়ের কোণে সাজিয়ে চির অম্লান রাখবেন। আপনাদের হৃদয়ের আঙ্গিণা এই ঘটনাগুলির স্মরণে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকবে। যাদের হৃদয়ে এই স্মরণ সম্পৃক্ত আছে, তাঁদের থেকে আহমদীয়া আকাশে আলো বিচ্ছুরণকারী তারাও সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের এই তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ-মাওলানা বশীরুর রহমান
সদর মুরব্বী

রহমতের বারিধারা

সেদিন প্রভাতে জান্নাত হতে নেমে এসেছিল রহমতের বারিধারা;
আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল যত দূর আকাশের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা।
'সালাম সালাম' রবে ফিরিশ্‌তাগণে বেহেশ্‌তের দুধারে দাঁড়িয়ে,
অভিনন্দন জানিয়েছিল তোমাদের ব্যাকুলে দু'হাত বাড়িয়ে।
খুশির ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, যেন চারিদিকে ছিল ঈদ,
শহীদী রক্তে গোসল করেছিল সেদিন খুলনার মসজিদ।
অপূর্ব এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখেছিল সেদিন খুলনার জনগণ,
ধর্মের পথে অকাতরে রক্ত প্রাণ দিতে সবার জীবন পণ।
মসজিদ মিনারে শোনা যায় ঐ নব বিজয়ের বারতা,
নতুন শতাব্দীতে রচিত হবে সাত শহীদের অমর জীবন গাঁথা।
তোমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সবাই মিলে,
হাতে হাত ধরে অংশ নেব আহমদীয়তের বিজয় মিছিলে।
তোমাদের রক্ত ছুঁয়ে শপথ নেব আজ নতুন করে জীবন গড়ার,
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব আহমদীয়তের প্রচার।
হে শহীদেরা ! তোমাদের নাম লিখা রবে চিরকাল ধরে,
আহমদীয়তের ইতিহাসের পাতায় পাতায় সোনার-ই আখরে।
শহীদ পরিবারকে কী জানাব হায়, জানা নেই সেই ভাষা,
শুধু জানি তাদের তরে আছে মোর বুকভরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।
হে ভাইয়েরা! শহীদের সাথে হয়েছ যারা গাজী,
"তোমরা বেহেশ্‌তের চির-কিশোর সাকী, যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তোরাজি।"
হে শহীদেরা ! তোমাদের তরে মোদের হৃদয়ে আনন্দ মিশ্রিত বেদনা,
তোমরা অজয়, তোমরা অমর, তুলনা বিহীন তুলনা।
আকাশে বাতাসে শোনা যায় আজি তোমাদেরই আহ্বান,
আমরা যারা রয়েছি পিছনে হতে হবে আগুয়ান।

– রশদা রাহাত করবী
গাজীপুর জামাত

বিশেষ দোয়ার আবেদন

মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর বেশ কিছুদিন যাবত অসুস্থ আছেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে ঢাকার একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। ১১দিন হাসপাতালে থাকার পর আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে অনেকটা আরোগ্য লাভ করে তিনি গত ২০ ফেব্রুয়ারী বাসায় ফিরে এসেছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। সকলের নিকট তাঁর পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘ জীবনের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। তিনি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের খেদমত করে যেতে পারেন।

পরিবারের সদস্যদের পক্ষে
আহমদ তবশির চৌধুরী

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

মোহাম্মদ তারেক কোরায়শী, পিতা- মোহাম্মদ আরেফ কোরায়শী, গ্রাম-তারুয়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং জল রং বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক লাভ করে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য, সে একজন মূক ও বধির। তার এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে সে জন্য খাসভাবে সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

– সালাহউদ্দিন আহমদ

(সূচীর পাতার অবশিষ্টাংশ)

তাঁর বক্তব্যে তিনি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ তথা মুসলিম বিশ্বে মোল্লাতন্ত্র কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন ফতোয়ার বিপরীতে আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত ইসলামের সুন্দর এবং সুস্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরেন। এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন সৌন্দর্যমন্ডিত ঘটনা তুলে ধরেন হুযূর আকদস (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম রাজা নাজির আহমদ সাহেব। তিনি তাঁর বক্তব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শান ও মর্যাদা তুলে ধরে বলেন আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল'যে তাঁর (সঃ) জীবনের প্রতিটি ঘটনা এত সুস্পষ্টভাবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। সমস্ত নবীদেরকে প্রচলিত অপবাদ থেকে মুক্ত করে তিনি তাঁর (সঃ) শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করেছেন। তিনি আরো বলেন - নবী করীম (সঃ)-এর খোদাপ্রীতি, মানবপ্রীতি, জনসেবা, তবলীগ, আল্লাহ্‌র উপর তাঁর বিশ্বাস, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অনুকরণীয় এবং ছোট, বড়, ধনী, গরীব, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষণীয়। এরপর সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন স্থানীয় আমীর জনাব মোবাশ্বের উর রহমান। সবশেষে হুযূর আকদস (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেবের পরিচালনায় দোয়ার মাধ্যমে ২ দিন ব্যাপী এই মহতি জলসার সমাপ্তি ঘটে।

মাগরিব নামাযের পর শুরু হয় আমন্ত্রিত জেরে তবলীগদেরকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মাওলানা সালেহ আহমদ।

এখানে উল্লেখ্য যে, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে একটি চাইনজ রেষ্টুরেন্টে চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক সম্মিলনী সভার আয়োজন করা হয়। এতে সমাজের প্রায় ৩৫ জনেরও অধিক সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত থেকে জামাতের বিষয়ে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসির আহমদ ও মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

নেছার আহমদ
সেক্রেটারী
২০তম সালানা জলসা কমিটি-২০০০

অতীব শান ও শওকতের সাথে মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস উদযাপন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব দারুত তবলীগ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস উদযাপন করা হয়।

সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মোহতরম মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। প্রায় দু'শ'জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেয মোহাম্মদ মনসুর আহমদ। উর্দূ নযম পরিবেশন করেন জনাব সুলতান আহমদ। এরপর বক্তাগণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাযিঃ) -এর জীবনের নানা দিক নিয়ে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব ফজলুর রহমান, হাবিবুল্লাহ্, অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, প্রাক্তন ন্যাশলনাল আমীর। জনাব সানাউল হক রিংকী বাংলা নযম পরিবেশন করেন।

এ ছাড়াও যেসব জামাত ও সংগঠন থেকে এ দিবস পালনের সংবাদ পাওয়া গেছে তারা হলেন ঃ রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মাহিগঞ্জ ও কুমিল্লা জামাত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। আরও সংবাদ আসছে।

– আহমদী বার্তা

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা

মূলঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ (মরহুম)

(২য় কিস্তি)

ঐসব দিনে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ওপর খুবই নির্যাতন করা হতো। বাড়ী বাড়ী গিয়ে নর ও নারীদের ধরে আনা হতো এবং বন্দী করা হতো (প্রেরিত ৮ঃ৩)

যুলুম-নির্যাতনের এ ধারা তিন শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। আসহাবুল কাহ্ফ (গুহাবাসী) নামে এদের উল্লেখ কুরআন মাজীদে এসেছে। যুলুম-নির্যাতনের প্রকোপে ক্লান্ত হয়ে তাদেরকে অন্ধকার গুহার মধ্যে আশ্রয় অবলম্বন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আর ঐ সব গুহায়ও তাদেরকে পশ্চাদানুসরণ করা হতো। এবং যখন হাতের নাগালে পেতো খুবই ভয়ানক পদ্ধতিতে তাদের হত্যা করে দেয়া হতো। ক্যাটাকম্বস অব রোম (Catacombs of Rome) এসব নির্যাতনের জীবন্ত সাক্ষ্য এবং তাদের ওপরে বিপদের পাহাড় এজন্যে নিপতিত করা হতো যে, তারা সমাকালীন শাসক-গোষ্ঠীর সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসগত মতভেদ পোষণ করতেন।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সহী মুসলিমে 'আসহাবে উখদূদ' প্রসঙ্গে এই বর্ণনা রয়েছে যে, এক মূর্তিপূজারী বাদশাহ্ এক যুবককে এক যাদুকরের নিকট থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছিল। যখন সে তার বাড়ী থেকে যাদুকরের নিকট যেতো তখন পথে একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসীর নিকটে বসতো। আর তার নিকটে তৌহীদ (একত্ববাদ) শিখতো। কিছু দিন পরে ঐ যুবক রুগীদের আরোগ্য করতে লাগলো। যখন বাদশাহ্ ইহা জানতে পারলো তখন সে ঐ যুবককে বন্দী করে জেলখানায় পাঠালো এবং নানা প্রকার কষ্ট দিতে থাকলো। শেষে সে সন্ন্যাসীর খবর বলে দিলো। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দরবারে আনা হলো। তাঁকে বলা হলো 'ইরজি' 'আন দীনিকা- তোমার ধর্মকে পরিত্যাগ করো। যখন তিনি অস্বীকার করলেন তখন তাকে করাত দ্বারা চিড়ে দু'টুকরো করে ফেলা হলো। এর পরে ঐ যুবককেও হত্যা করে ফেলা হলো। এ ঘটনার পরে বহুলোক আল্লাহ্তাআলার ওপরে ঈমান নিয়ে আসলো। ঐ বাদশাহ্ কয়েকটি পরিখা খনন করে উহার মধ্যে আগুন জ্বালালো এবং আদেশ দিলো – মাল্লাম ইয়ারজি' আন দীনিহি ফাআকমাতুমুহু ফীহা (যে তার ধর্মকে পরিত্যাগ করবে না তাকে আগুনে নিক্ষেপ করো)।

এসব লোক মুরতাদ (অর্থাৎ ধর্ম থেকে ফিরে গেছে) হয়ে গেছে। তাদেরকে প্রথম তওবা করার সুযোগ দাও। আর যে ব্যক্তি তার প্রাক্তন ধর্মের দিকে ফিরে না আসবে তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করো। পরিশেষে সকলকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারা হলো। আর এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্তাআলা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের উল্লেখ করেছেন।

"ধ্বংস হলো পরিখাসমূহের অধিবাসীরা – ইন্ধনপূর্ণ আগুনের (পরিখাসমূহ) – যখন তারা তার ওপরে উপবিষ্ট ছিলো। এবং তারা মু'মিনগণের সাথে যে ব্যবহার করেছিলো, সে বিষয়ে তারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলো। আর তারা মু'মিনদের সঙ্গে শুধু এ কারণে শত্রুতা পোষণ করেছিলো যে, তারা মহাপরাক্রমশালী অতীব প্রশংসনীয় আল্লাহ্র ওপরে বিশ্বাস আনয়ন করেছিলো" (সূরাতুল বুরূজঃ ৫-৯)।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে উভয় জগতের নেতা জিন্ন ও মানুষের নেতা, নবীদের নেতা খাতামান্নবীঈন হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সৌন্দর্য বিকাশক নুবওয়তের সিংহাসনে সমাসীন হন। যখন তিনি ঐশী-বাণী প্রচার শুরু করলেন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা, যাদের মধ্যে তাঁর (সঃ) নিকটাত্মীয়-স্বজনও ছিল, কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করলো। এমনকি তাঁকে (সঃ) মক্কাবাসী ব্যতিরেকে অন্যান্য গোত্রের নিকট বলতে হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আমাকে তার গোত্রভুক্ত করে নিতে পারো। কেননা, কুরাইশরা "মানউনী আন আবলাগা কালামি রব্বী" অর্থাৎ আমাকে আমার প্রভুর বাণী পৌছাঁতে বাধা দিয়েছে (আবূ দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩, মুজতাবাঈ ছাপাখানা দিল্লী)।

বিরুদ্ধবাদীরা মক্কার চারিদিকে পাহারা বসিয়েছিলো যেন তিনি (সঃ) অন্য কোনখানে না যেতে পারেন। আর না অন্য গোত্রের লোকেরা তাঁর (সঃ) নিকট আসতে পারে। তাঁর (সঃ) মান্যকারীদের পিপাসায় জর্জরিত করা হলো। এবং রৌদ্রতপ্ত ভূমিতে শুইয়ে বুকের ওপর উত্তপ্ত পাথর চাপা দেয়া হলো। আর ঠিক দুপুর বেলা তপ্ত বালুকা রাশির ওপর হেঁচড়ানো হলো। দু'টি ভিন্ন দিকে গমনকারী উটের সাথে বেঁধে উটকে দৌড়িয়ে তাদেরকে চিড়ে ফেলা হলো। এবং এভাবেই বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তাদেরকে হত্যা করা হলো। আর তিন বছর পর্যন্ত তাঁর সাথে বনী হাশিমের সকলকে বয়কট (অবরুদ্ধ) করা হলো। যখন আঁ হযরত (সঃ) তায়েফে গমন করেছিলেন তখন সেখানকার গুন্ডা বদমায়শেদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়া হলো। তারা তাঁর (সঃ) ওপরে পাথর বর্ষণ করতে করতে শহরের বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। এবং সবশেষে কুরায়েশদের সকল নেতা একত্রিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটলো। আর এর জন্য কুরায়েশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন যুবককে মনোনীত করা হলো, যেন তাঁকে হত্যা করার কাজে সকল গোত্রের অংশীদারিত্ব থাকে এবং তাঁর (সঃ) গোত্র বনী হাশিমের প্রতিশোধ নেবার সাহস না হয়। কিন্তু খোদার রসূল (সঃ) রাতের মধ্যেই স্বীয় প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায় নিজের প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বের হয়ে গেলেন। মক্কাবাসীরা বিশ্বাসীদের সাথে যেসব যুলুম অত্যাচার করেছিলো আল্লাহ্তাআলা তার বিবরণ নিম্নোক্ত ভাষায় দিয়েছেনঃ

"অতএব যারা হিজরত করেছে এবং তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আর আমার পথে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে " (সূরাতু আলে ইমরানঃ ১৯৬ আয়তাংশ)।

আল্লাহ্তাআলার এর সাক্ষ্য এ বিষয়ে যে, এসব লোকদের ওপরে যারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে প্রাথমিক যুগে বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন,

মক্কার নেতৃবৃন্দ এত যুলুম অত্যাচার করে যে, তারা তাদের নিজেদের সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে অন্যান্য শহরে চলে গিয়েছিলেন এবং যাঁরা দরিদ্র, নিরীহ ও দুর্বল লোক মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন তারা আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে খুবই বিনয় ও আকুতি মিনতি করে কান্না-কাটি করতেন এবং বলতেনঃ

"হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে এ শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাও, এর অধিবাসীগণ খুবই যালেম ও অত্যাচারী (সূরাতুন্ নিসা ঃ ৭৬ আয়াতাংশ)।

কুরাইশরা এসব নির্যাতিতদের ওপরে নির্যাতন চালাতে কুণ্ঠিত হয় নি। এর কারণে সাহাবায়েকেরাম স্বীয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাফিররা তাদের পিছন ছাড়ে নি। আর স্বীয় শক্তিমদমত্তে বলীয়ান হয়ে তাদরেকে দুর্বল ও বিনাশ করার চেষ্টার ত্রুটি করে নি। এবং তাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। তাদের উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম গ্রহণকারীগণ তাঁকে পরিত্যাগ করে নিজেদের বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে আসে। যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ

"তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতো" (সূরাতুল বাকারাহ্ঃ ২১৮ আয়াতাংশ)।

আর মক্কার কাফিরদের এসব নির্যাতন ও পাশবিক অন্যায় পথ অবলম্বনের কারণ কেবল ইহা ছিলো যে, তারা মুসলমানদের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) মনে করতো। এবং এই উদ্দেশ্যেই ঐসব সাবী অর্থাৎ নিজেদের জনপদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণকারী বলা হতো।

আফসোসের বিষয় এই যে, পরিশেষে নির্যাতিতরা নির্যাতনকারীতে পরিণত হয়!

যেভাবে উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌তাআলার নবীগণ ও তাদের জামাত ধর্মীয় বিশ্বাসে মতভেদ থাকার কারণে কখনও কারও ওপরে নির্যাতন চালায় নি। এবং ধর্মের ব্যাপারে শক্তি ও বিদ্বেষকে কখনও ছড়ায় নি। বরং তাদের বিরুদ্ধবাদীরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভিযোগ উত্থাপন করে তাদের ওপরে কঠোর নির্যাতন করতে থাকে।

দুঃখের বিষয় এই যে, যেসব সত্যাশ্রয়ী লোকদের ওপরে কেবল ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভেদের কারণে নির্যাতন চালানো হয়েছিলো, তাদের পরে যখন তাদের সধর্মীরা ও স্থলাভিষিক্তরা শাসন-ক্ষমতা ও শক্তি লাভ করলো তখন তারাও ঐ পথই অবলম্বন করলো যা তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে ধর্মীয় বিদ্বেষপোষণকারীরা অবলম্বন করেছিলো। অর্থাৎ তারাও ধর্মীয় মতভেদের কারণে লোকদের ওপরে বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালায় এবং কঠিন থেকে কঠিনতর যুলুম-নির্যাতন চালায়।

জগৎ বারে বারে এ দৃশ্য দেখেছে যে, কোন ধর্মের প্রারম্ভে তো ইহাকে গ্রহণকারীগণ অস্বীকারকারীদের চরম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। কিন্তু কখনও যদি এ ধর্মাবলম্বীদের হাতে শাসন-ক্ষমতা চলে আসে তখন তারাও নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধীদেরকে চরম নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে। প্রাথমিক কাল থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত এভাবেই চলে এসেছে।

দীর্ঘতা থেকে বাঁচার জন্যে আমি কেবল একটি ধর্মের কথা বলছি। উহা হলো খৃষ্ট ধর্ম। আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, খৃষ্টানদের ওপরে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়েছে। এবং তাদের এ যুলুম-নির্যাতন ৩০০ বছর ধরে অব্যাহত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে আগমনকারী খৃষ্টান পাদ্রী ও বিশপ প্রভৃতি, যাদের শাসন-ক্ষমতা লাভ হয়েছিলো, ধর্মীয় বিশ্বাসে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মতভেদের ভিত্তিতে তারা কঠোর থেকে কঠোরতর যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করেছে। তারা ইউরোপে বিচারকার্যের জন্যে এমন তদন্ত বেঞ্চ গঠন করেছিলো যে, তাদেরকে সব রকম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো। যাদের ওপরে পথভ্রষ্টতা ও কুফরীর সন্দেহ হতো তাদেরকে তাদের সম্মুখে ডেকে এনে যেমন খুশী শাস্তি প্রদান করতো। ইহুদীদের সম্বন্ধে তাদের এই সিদ্ধান্ত ছিলো যে, তারা সাথে সাথেই তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) পথভ্রষ্ট ও শাস্তিযোগ্য নির্ধারণ করে দিতো, যখন কিনা কেউ খৃষ্টবাদের বিশ্বাসের ওপরে বা খৃষ্টান সমাজের ওপরে আক্রমণ করতো বা কোন খৃষ্টানকে ইহুদী বানাতো অথবা কোন খৃষ্টান হওয়ার পরে আবার ইহুদী ধর্মের ফিরে নিয়ে যেতো।

খৃষ্টানরা সধর্মীগণের ওপরে ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে যে অকথ্য নির্যাতন চালাতো তার মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা যাচ্ছে (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাঃ ৯ম সংস্করণ, "Inquisition" শব্দের অধীন):

(১) জন ওয়াইক্লিফ (John Wycliffe) Reformer (সংস্কারবাদী) ক্যাথলিক পাদ্রীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো। আর তাদের ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস যা কিনা বাইবেলের পরিপন্থী ছিলো, রদ করে দেয়, তার ভুল ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে এবং যেহেতু সে বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ করে এ কারণে ক্যাথলিক পাদ্রীরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার ওপরে ও তার অনুসারীদের ওপরে ভয়ানক নির্যাতন চালায়।

জন ওয়াইক্লিফ-এর অনুসারীদের লোলর্ডস বলা হয়ে থাকে। তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্যে লোক তাদের বাড়ীতে ঢুকে যেতো এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিতো। তাদের বন্য জন্তুর ন্যায় পিছু ধাওয়া করা হতো এবং জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হতো এবং তাদেরকে সারা জীবনের তরে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করা হতো। তাদের সবচে' বড় অপরাধ এই ছিলো যে, তারা বাইবেলকে নিজেদের মাতৃভাষায় পাঠ করতো (History of Priest craft in all Ages, by William Howilt, P-105)।

(২) আবার আর্ক বিশপ আর্ণডেল ১৪০০ খৃষ্টাব্দে পথভ্রষ্টদের জ্বালিয়ে দেবার আইন বানিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে জারী করে। ঐ আইন এমন ছিলো যে, যদি চার্চের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী কাউকে প্রচার করতে পাওয়া যায় তাহলে তাকে চার্চ থেকে বিতাড়িত করার শাস্তি দেয়া হবে এবং কাফির ও ধর্মত্যাগী বলে দেয়া হবে। এবং যদি কেউ ওয়েক্লিফ বা তার শীষ্যদের পুস্তকাদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি ব্যতীত পড়তে দেখা যায় তাহলে ঐ আইনের পরিপন্থী কাজ হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং ১৪১০ খৃষ্টাব্দে ঐ আইনের কথা ছিলো নিম্নরূপ। (চলবে)

অনুবাদ–মোহাম্মদ মুতিউর রহমান।

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

চতুর্থ অধ্যায়

(৪৪তম কিস্তি)

যৌতুক একটি মরণ ব্যাধি ঃ

এযুগে যৌতুকের আলোচনা ছাড়া বিবাহের আলোচনা পূর্ণ হয় বলা যায় না। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে যৌতুক শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে, বিবাহে বর-কন্যাকে যে সব মূল্যবান দ্রব্য দেয়া হয়। চলন্তিকায় বলা হয়েছে, পাত্র-পাত্রীকে প্রদেয় অর্থ ও উপহার।' দেখা যাচ্ছে যৌতুকে বর কনে উভয়েরই অংশ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পাত্রপক্ষে যৌতুককে যেভাবে একচেটিয়া করে নিয়েছে এবং এজন্য চূড়ান্ত জোর জবর-দস্তি খাঁটাচ্ছে তাতে আভিধানিক অর্থ ও তাৎপর্যের নাম-গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ইসলাম ধর্মের তথাকথিত অনুসারীরা জোর করে কন্যার পিতা-মাতার কাছ থেকে নিজেদের খায়েশমত একাধিক বার (বিবাহের অনেক পরও) অর্থ (পরিমাণে কম নয়), টিভি সেট, হুন্ডা ইত্যাদি আদায় করার জন্য স্ত্রীর উপর মারাত্মক নির্যাতন চালায় ও নানাভাবে চাপ দিতে থাকে। স্ত্রীর পিতা-মাতা জামাতার অযৌক্তিক এই হীনদাবী পূরণে অপারগ হলে স্ত্রীকে হত্যা করে এর প্রতিশোধ (!) নেয়। পত্রিকাদিতে অহরহ এরূপ সংবাদ দেখা যায়। এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো। ৯.৮.৯৯ তারিখের সংবাদে, বাঁচতে শেখা ❑ আঞ্জেলার ইতিহাস হয়ে বেঁচে থাকা 'সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ' নামে প্রতিবেদনের এক স্থানে বলা হয়েছে; আঞ্জেলা হামেজ নিপীড়িত-নির্যাতিত হাজারো মূক মহিলার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। যশোহর সদর থানার মন্ডলগাতি গ্রামের শাহিমুদা খাতুন বুলু তার এক জ্বলন্ত প্রতীক। অসহায় দরিদ্র পিতার মেয়ে বুলুর বিয়ে হয়েছিল; কিন্তু যৌতুক দিতে না পারায় স্বামী তাকে গলায় দড়ি দিয়ে গোয়ালে বেঁধে বিচালি খেতে দিত। মানুষের অসাধ্য কাজটি অর্থাৎ বিচালি খেতে না পারায় পাচুনি দিয়ে পিটিয়ে বুলুকে করতো সংজ্ঞাহীন। পাষন্ড স্বামীর কথা ছিল, গরু কিনে আনলে যেমন আর কিছুই পাওয়া যায় না, ঠিক বউকে বিয়ে করে কিছুই পাই নি। এ কারণে সে গরুর সমান। ওকে বিচালি খেতে হবে।.

আঞ্জেলা গমেজ এই বুলুকে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। তার গড়া প্রতিষ্ঠান 'বাঁচতে শেখায়, এসে বুলু বেঁচে গেছেন। তিনি এখন সমাজে সুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এক স্বনির্ভর মানুষ। তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫ হাজার সুখী মহিলার প্রতিচ্ছবি। এই জঘন্য অত্যাচারে অভিনবত্ব আছে বৈকি!

দারিদ্র্যে নীপীড়িত স্ত্রীর পিতা-মাতা জামাতার-হীন ও অযৌক্তিক দাবি পূরণে অপারগ হলে স্ত্রীকে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নেয়। হত্যা করে শাস্তি এড়ানোর জন্য মৃত্যু পথ যাত্রী স্ত্রীর মুখে কীটনাশক ঢেলে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে প্রমাণ করতে লেগে যায়। কতই না হীন প্রচেষ্টা! অনেক ক্ষেত্রে বিচারে অপরাধীরা শাস্তিও পাচ্ছে। এদেশে তথাকথিত মুসলমানদের দ্বারা এসব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে বলে ইসলামকে দোষারোপ করা মারাত্মক ভুল হবে। এরূপ যৌতুকের সাথে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটে মোহরানা আদায় করার মাঝে। বস্তুতঃ যৌতুক এ যামানায় 'জীবননাশকের' রূপ ধারণ করেছে, সামাজিক মরণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে মোহরানা হলো 'জীবনবীমা' স্বরূপ। হঠাৎ স্বামী মারা গেলে বা পরিবারের রুজি-রোজগারের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে স্ত্রী মোহরানার অর্থে সন্তানদের নিয়ে সাময়িকভাবে দাঁড়াবার পথ খুঁজে পায়।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, যারা এদেশের তৌহিদী জনতার প্রসংশায় পঞ্চমুখ, তথাকথিত কাফির মুরতাদদের শাস্তি দিতে সদা তৎপর সেই মোল্লা ভাইয়েরা যারা ধর্ষণ-গণধর্ষণ ও যৌতুকের সাথে জড়িত এবং অধিকাংশই নামের পরিচয়ে মুসলমান তাদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় তালীম-তরবীয়তের জন্য আন্দোলনতো দূরের কথা তেমন কোন প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে না। মনে হয় তাদের যোগ্যতার অভাবেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারা এসব লোমহর্ষক ঘটানার নীরব দর্শকমাত্র।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ঃ আল্লাহ্ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সম্পর্কে শুধু যৌনপ্রেরণা পূরণে তথা দৈনিক আচরণেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বরং এতে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন (২ঃ৮৮)।

আয়াতের একাংশে বলা হয়েছে ঃ (তর্জমা) 'তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোষাক (স্বরূপ), তোমরা তাদের পোষাক (স্বরূপ)। 'মানুষের জীবনের পোষাকের গুরুত্ব বিবেচনা করলেই এসব কথার গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যাবে। পোষাক লজ্জা নিবারণের প্রধান সহায়ক। সংযমের জীবন যাপন দ্বারা-স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের নিকটতম সহযোগী হতে পারে। পোষাক শীতাতপে আমাদেরকে রক্ষা করে থাকে। তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সুখ-দুঃখের ভাগী ও ভোগী হতে হবে। তাতে জীবনে নৈরাশ্য স্থান করে নিতে সুযোগ হারাবে। পোষাক দৈনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে থাকে। তেমনি স্বামী-স্ত্রী শুধু দৈহিক নয় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন গড়ায়ও একযোগে সক্রিয় হতে পারে। তারা সন্তান-সন্ততি, পাড়া-পরশীকেও এসব বিষয়ে সুযোগমত অবহিত করতে পারে। পোষাক দ্বারা মানুষ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়। সব সমাজেই নারী পুরুষের পোষাক আলাদা হয়ে থাকে। জনগণ হতে পুলিশ ও সৈন্যদের পোষাক ভিন্ন ধরনের হয়। আজকাল অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট ধরনের পোষাক পড়তে হয়। বিবাহ ও তেমনি স্বামী-স্ত্রীকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে থাকে।

শত্রুর আক্রমণে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পোষাক ব্যবহার করা হয়। তেমনি আমাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীও একে অন্যের সহযোদ্ধা হতে পারে। আল্লাহ্ তা-ই চান। পোষাক সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ (তর্জমা) এবং তোমাদের জন্য নানাপ্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তোমাদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করে, এবং কতক পোষাক পরিচ্ছদ সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে।' (১৬ঃ৮২ আয়াতাংশ)। আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ (তর্জমা) হে আদম সন্তান ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোষাক নাযেল করিয়াছি যাহা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করে এবং যাহা সৌন্দর্যস্বরূপ; কিন্তু তাওয়ার পোষাক-সর্বোত্তম। ইহা আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর অন্যতম যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারো।' (৭ঃ২৭) এ আয়াতে 'তাকওয়ার' পোষাককে সর্বোত্তম বলেছেন। এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ্ যে ধরনের পোষাক পসন্দ করেন, তা ব্যবহার করা। পোষাক যে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উত্থান-পতনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তা বর্তমান 'উন্নত' বিশ্বের দাবীদারদের পোষাকের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক পোষাকের

ক্ষেত্রে উলঙ্গপনার (বিশেষভাবে নারীদের বেলায়) প্রবল স্রোত বইছে। তা প্রত্যক্ষ করার জন্য দূরে যেতে হবে না। ঘরে বসে টিভির দিকে তাকালে বা স্টলে অশ্লীল পত্র-পত্রিকার ছড়াছড়ি দেখাই যথেষ্ট। এসব যেন চীৎকার করে ঘোষণা করছে, 'হে আদম সন্তানেরা। নিজেদের কল্যাণের জন্য শালীনতার দিকে সত্বর ফিরে এসো, নয়তো নগ্নতায় ডুবে মরবে। স্বামী-স্ত্রী সময়ে পিতা-মাতা হয়, হয় তারা শ্বশুর-শ্বাশুরী, দাদাদাদী, নানা নানী আরো কতকিছু। বিবাহে যেন সম্পর্ক তথা আত্মীয়তার গাছ লাগানো হয়। এতে যাতে সুফল ফলে সেদিকে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(গ) বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ

ইসলামে প্রদত্ত বহু বিবাহের ব্যবস্থাকে অনেকেই বিশেষ করে পশ্চিমা পন্ডিতেরা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে থাকেন। তারা এমনও বলেন যে, একজন পুরুষকে একই সাথে চার স্ত্রী রাখার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু নারীকে সে অধিকার হতে বঞ্চিত রেখে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। যেন তাদেরকে এ অধিকার দিলে বহু বিবাহে কোন দোষ থাকতো না ! ইতিঃপূর্বে আমরা দেখে আসছি যে, এক নারীর একাধিক স্বামী থাকলে সন্তানের পিতা নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াতো।

বহু বিবাহ সম্পর্কে গুরুত্বসহ হৃদয়ংগম করা দরকার যে, ইসলাম এর অনুমতি দিয়েছে মাত্র, কখনও অবশ্য-কর্তব্য হিসেবে আদেশ দেয় নি। এই অনুমতির কারণগুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তাতে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত সাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া সমাজে বিধবা, আশ্রয়হীন নারী বিশেষ করে এতীমদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাদেরকে সেবা-যত্নে মানুষ করা সমস্যাবহুল হয়ে পড়ে। তাতে ব্যক্তি জীবনেই ব্যর্থতা বাসা বাঁধে না, সামাজিক জীবনেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এসব অবস্থা হতে মুক্তির জন্যই বহু-বিবাহের অনুমতি।

ব্যক্তি জীবন হতে কিছু কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। ১৯৫৮-৫৯ সালে আমেরিকায় ছিলাম। চার্চে ইসলাম সম্পর্কে বলার জন্য মাঝে মাঝে দাওয়াত পেতাম। এসব দাওয়াতে বক্তৃতার পর অধিকাংশ সময়েই ইসলামের বহু বিবাহ নিয়ে মহিলাদের পক্ষ হতে প্রশ্ন আসতো– নারীদের প্রতি এই অবিচার কেন ? তাদের সামনে দু'টো ঘটনা তুলে ধরলে কেউ কেউ বলতো- এতে চিন্তার খোরাক আছে। প্রথম ঘটনাটি হলো তখন আমেরিকায় যুবতীদের সংখ্যা যুবকদের চেয়ে কয়েক লাখ বেশী ছিলো। দ্বিতীয় তখন নাভাসোটা এলাকায় তরমুজের ফলন খুব বেশী হওয়ায় দাম একদম পড়ে যায়, এমন কি ক্ষেতেই অনেক তরমুজ পচতে থাকে। এ নিয়ে স্থানীয় পত্রিকাদিতে লেখালিখি হতে থাকে। তখন বলতাম ইসলামে তরমুজের চেয়ে নারীর মূল্য হাজার হাজার গুণ বেশী। তাই এ অবস্থায় পুরুষের একাধিক বিবাহ দ্বারাই এর সুরাহা হতে পারে। তা না হলে সমাজে যৌন অনাচার বেড়ে যাবে তাতে নারীদের ভোগান্তি হবে অনেক। তখনকার সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় পুরুষের সংখ্যা বেশী হওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় ঐ দেশে পুরুষদেরকে সংযম অবলম্বন করতে হবে বা ভিন দেশে বিবাহের চেষ্টা করতে হবে– যাতে যৌন জীবন কলুষিত না হয়।

বহু-বিবাহ সম্পর্কে কুরআন কি বলে দেখা যাক ঃ তোমরা যদি আশংকা কর যে, এতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা। (৪ঃ৪) এখানে কিছু বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। যেমন (১) নারী অর্থে স্বাধীনা নারী। কারণ এর পরই দাসীর উল্লেখ রয়েছে। এতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে গিয়ে, একজন পুরুষ চারিটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারে (৩) দাসী-অর্থে ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধ-বন্দিনী উভয়কে বুঝায়। এখানে আরো একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে ঃ

'এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না; যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (৪ঃ১৩০)। একজন মু'মিন জীবন যাপনে নিজের খায়েশের চেয়ে আল্লাহ্র নির্দেশকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে এর প্রতি ফলন ঘটনোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে যেসকল নারীর কথা বলা হয়েছে তারা খুবই দর্দশাগ্রস্ত এবং বিবাহই এসব দুর্দশা দূর করার গুরুত্বপূণ পন্থা। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ এরূপ নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে।

১৯৫৮-৫৯ সালে আমরিকার টেক্সাসে প্রশিক্ষণরত ছিলাম। তখন হিউজস্টন পোষ্ট পত্রিকায় একজন আমরিকান মহিলার চিঠি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেছিলেন যে, আমেরিকান সমাজে স্বামীরা এক বিবাহ করে ঠিকই কিন্তু এতোই বহুগামী যে, তারা মুসলিম সমাজে যে একই সাথে বহু স্ত্রী রাখতে পারে এর চেয়ে অনেক বেশী নারী ভোগ করে থাকে। ঐ পত্রিকায় কুরআনের উপরোক্ত আয়াত দু'টোর তর্জমা (ইংরেজী) দিয়ে পত্র লিখি। এতে মোট কথা ছিলো যে, তাদের সমাজ সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই বল্লেই চলে। তাই তার কথা আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে। আরো মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বহু-বিবাহ প্রচলিত নেই। যদি তা-ই হতো তবে বহু পুরুষ বিবাহ হতে বঞ্চিত হতো। এমনটি হয়েছে বলে আমার জানা নাই। হিউজস্টোন পোষ্ট 'চারই শেষ সীমা' 'Four is the Limit'] হেড লাইন) দিয়ে ফলাও করে চিঠিটি প্রচার করে। এই মহিলা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কুরআনের ইংরেজী তর্জমা পড়া শুরু করেছি প্রায় ৬/৭ মাস আমাদের মাঝে লেখালেখি চলে। শেষ পর্যন্ত তিনি লিখেন 'সামগ্রিক বিচারে' (By all means) আমি একজন মুসলিম। এজন্য চার্চ আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে, স্বামীও খুব আড়চোখে দেখছে। তিনি আরো লিখেন-আমার মনটা চায় কুরআনের আদর্শে গড়ে উঠা সমাজ দেখতে। তার শেষ কথাটি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। বেশ কয়দিন চিন্তা-ভাবনার পর তাকে লিখি বাইবেল বলে, 'গাছের ফলে পরিচয়'। কিন্তু কাচা বা পচা ফলে তা নিশ্চয় নয়। তখন একথা মনে আসে নি যে, ভারতের কাদিয়ানে ও পাকিস্তানের রাবওয়াতে এরূপ সমাজ গড়ে ওঠেছে। এখনতো এরূপ সমাজ ১৬০টি দেশে ক্ষুদ্র আকারে বিরাজমান। অবশ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক ওয়াশিংটন হতে প্রকাশিত বেশ কিছু পুস্তকাদি তাকে দিয়েছি। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মু'মিন ও ওসীয়্যত

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে হেদায়াতের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। ফীভাবে আল্লাহ্কে পাওয়া যায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়-তার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আল্লাহ্র উত্তম সৃষ্টি মানুষ (লাকাদ খালাকনাল ইনসানা কী আহসানে তাকবীম-সূরাতুত্ তীন)। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাই, তিনি তার সৃষ্ট এ মানুষকে তাঁর ভালবাসা লাভের পদ্ধতি শিখাতে বর্তমান বিশ্ব ও প্রজন্মের জন্য উপহার দিয়েছেন -'কুরআন'। এ কুরআনে কোন সন্দেহ নেই। মূলের পরবর্তীতে কোন সংযোজন নেই -এতে কোন বিকৃতিও নেই; কেননা এর হেফাযতকারী আল্লাহ্ নিজে। মানুষ যদি এতে তাদের পান্ডিত্য জাহির করতে পারত- তাহলে এ দেড় হাজার বছরে কুরআনের অবস্থাও খ্রীষ্টানদের বাইবেলের মতই হয়ে যেতো। যার যার ইচ্ছামাফিক এতে যেমন সংযোজন হতো-অপসন্দ হলে, তেমনি অনেক পবিত্র বাক্য (আয়াত) বাদ বা বাতিল করা হতো। এ কুরআন মুখস্ত রাখার (হিফয) ব্যাপারটি চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমানদের চিন্তার খোরাক। আজ সারা দুনিয়াতে অসংখ্য মুসলমান এ কুরআন 'হিফয' করে রেখেছেন। তা'ছাড়া, এ কুরআনের সঠিক অর্থ ও মর্মার্থ বুঝাতে প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতে মুজাদ্দিদ পাঠানোর ব্যবস্থা রেখেছেন। এ মুজাদ্দিদগণ ধর্ম (ইসলাম)-কে সঞ্জীবিত করেন। বাগানের গাছ-গাছালি যেমন মৃতপ্রায় হয়ে গেলে মালির পরিচর্যায় নতুন ও আগের আসল রূপ লাভ করে-মুজাদ্দিগণ ও আল্লাহ্র 'মালি' হয়ে দুনিয়ার মানুষগুলোর পরিচর্যা করেন। আমাদের বাড়ীর গৃহস্থালীর দা-বটি যেমন পুরানো হয়ে গেলে-মরিচা পড়লে আমরা কর্মকারের দ্বারস্থ হই, এবং কর্মকার যেমন সে অচল, পুরানো দা-বটিকে আগুনে পুড়িয়ে পিটিয়ে নতুন করে দেন-মুজাদ্দিদের কাজটা-ঠিক সেই কর্মকারের মতোই। তবে এ মালী ও কর্মকারের নিয়োগদাতা -আল্লাহ্; মানুষের দ্বারা নিয়োগ পেলে এ মুজাদ্দিদগণ মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে এবং ফিরাতে পারতেন। এ পথ বিপদ সংকুল-এ যেন গহীন অরণ্যে সাপ, কাঁটা ও হিংস জন্তু-জানোয়ার অতিক্রম করে নির্দিষ্ট গন্তব্য পৌছার অভিযান।

এ যুগের বা হাজার বছরের পথ-নির্দেশক অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সিংহ পুরুষ মুজাদ্দিদে জামান হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। কেউ কেউ এ মহাপুরুষকে হযরত রসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ (সঃ) থেকে পৃথক সত্তা হিসাবে মনে করেন- তাই তাঁর বিরোধিতায় মুসলামানদের সব ফের্কা একীভূত। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত ও আল্লাহ্ কর্তৃক এ উম্মতের বর্তমান প্রজন্মের মুজাদ্দিদ। মুজাদ্দিদ পাঠানোর বা নিয়োগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তার-মানুষের নয়। মানুষ এ ক্ষমতা নিজের হতে তুলে নিলেই-বিশৃংখলা ঘটে। তাইতো মানুষের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও এ যামানার মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কার্যক্রম শতবর্ষ ধরেও থামেনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত সারা দুনিয়াতে তৌহীদ ও হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে লাখো মানুষ প্রতি বছরই তাঁর পতাকাতলে একত্রিত হচ্ছে। উম্মতে ওয়াহেদা প্রতিষ্ঠার এ এক অনন্য সংগ্রাম। আগেই বলেছি, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রকৃত ইসলামের অনুসারীদের জন্য একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ জামাতের কান্ডারী ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) । এ জামাত ধর্মীয়, রাজনৈতিক নহে। এ জামাতের প্রধান শাসক নহেন তিনি মু'মিনগণের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্য আল্-ওসীয়্যত নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকাতে তাঁর তিরোধানের পর নবুওয়তের ধারায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এ পুস্তিকায় তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খাঁটি উম্মত, খাঁটি মুসলমান, খোদাভীরু এবং শিরক হতে বাঁচার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। তিনি এ পুস্তিকায় তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলামের খেদমতে নিজের সম্পদ সাধারণভাবে উৎসর্গ করার পর উচ্চতর মু'মিন হওয়ার পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় লিখেন, "নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থা দ্বারা তিনি (আল্লাহ্) মুনাফিক ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করেন। আমি স্বয়ং অনুভব করি যে, এ ঐশী ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যে সকল ব্যক্তি কোন ইতস্ততঃ না করে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সমুদয় সম্পত্তির দশমাংশ খোদার পথে প্রদান করেন, বরং তদপেক্ষা অধিক নিজেদের উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তাঁরা আপন বিশ্বস্ততার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে থাকেন।"

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের সেই সমুদয় মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্রে যাঁরা বেহেশ্তী তাঁদেরকে আল্লাহ্র তরফ থেকে কাশ্ফের মাধ্যমে জ্ঞাত 'বেহশ্তী মাকবেরা'র শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন।

এ পুস্তিকায় তিনি লিখেন- "এ কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব গুরুত্বপূণ অনেক সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি এবং খোদা একে শুধু বেহেশ্তী মাকবেরা'ই বলেন নি বরঞ্চ এ-ও বলেছেন যে, সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এ কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নেই যাতে এ কবরস্থানবাসীদের অংশ নেই"।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এ পুস্তিকায় আরো লিখেন, "আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি যে, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু! হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সে লোকদেরকে এখানে কবরের জায়গা দান কর **যাঁরা তোমার এ প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ নিজেদের অন্তরে পোষণ করেন না** এবং ঈমান ও অনুবর্তিতার দাবীসমূহ পূরণ করে থাকেন, এবং তোমরাই জন্য এবং তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছেন। **যাদের উপর তুমি সন্তুষ্ট এবং যাদের সম্পর্কে তুমি জান যে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন** এবং তোমার প্রেরিতজনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বাসসহ প্রেম ও মরণপণ সম্পর্ক রাখেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন"।

প্রিয় পাঠক! এ অধম এতক্ষণ আপনাদের মত নেককার বান্দাদেরকে ওসীয়্যত সম্পর্কে এর পটভূমি ও গুরুত্ব সম্পর্ক মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। আপনাদের প্রতি আমার সবিনয় আরজ, আপনারা মনোযোগ সহকারে হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পুস্তিকাটি (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ এ বাংলায় পুন:মুদ্রিত) পড়ুন এবং এ ব্যাপারে আপনার করণীয় বিষয়টি নির্ধারণ করুন। আমরা ইতঃপূর্বে আহমদী পত্রিকায় ওসীয়্যত সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু ধারণা দিয়েছিলাম। আবারও আমরা এখন থেকে পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা মারফত আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দেবো, ইনশাআল্লাহ্। আপনারা এ বিষয়ে জানতে হলে-আমাদেরকে এ ঠিকানায় লিখুন- ওসীয়্যত বিভাগ প্রযত্নে পাক্ষিক আহমদী, ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাক-১২১১।

-এ,কে রেজাউল করীম।

দাজ্জালি ফিৎনা

দাজ্জাল সম্পর্কে বহু আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী, গল্প-গুজব সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে, যার কোন ভিত্তি নেই। আসলে দাজ্জাল একটি জাতি। যেমন আদ সামূদ ও কারা এক একটি জাতি। দাজ্জাল এবং ইয়াজূজ ও মাজূজ একই জাতির বিভিন্ন গোত্র বা শাখার নাম। প্রথমে তারা বিভিন্ন গোত্র বা শাখায় একই অঞ্চলে পাশাপাশি বাস করতো। তারা প্রথমে ককেসাস পর্বতের উত্তর দিগন্ত ভূভাগে ও মাঞ্চুরিয়া এবং ইউরাল পর্বতের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করতো। কালক্রমে জন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক নানান কারণে কর্তব্যের তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তারাই বর্তমানে জার্মানী, ফ্রান্স, আরমানিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য জাতি। দাজ্জাল সম্পর্কে হযরত রসূলে পাক (সঃ) মুসলমান জাতিকে নানাভাবে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইসলামের জন্য দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে ভয়াবহ আর কিছুই নেই"। দাজ্জালকে চিনবে ও তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য হযরত রসূলে পাক (সঃ) মুসলমান জাতিকে সূরা কাহ্ফের প্রথম দশটি ও শেষ দশটি আয়াত পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর এই নির্দেশের অর্থ ইহা নয় যে, উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়ে দাজ্জালকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে। বরং ইহা বুঝা যায় যে, দাজ্জালের সাথে মুসলমান জাতির মোকাবেলা করার যে কথা আছে ইহা ঢাল, তলোয়ার অথবা কামান বন্দুকের লড়াই করা নহে, যুক্তি ও প্রমাণের লড়াই। সূরা কাহ্ফের প্রথম দশটি এবং শেষ দশটি আয়াত পাঠ করলে দেখা যায় যে, ঐ আয়াতগুলিতে আল্লাহ্তাআলা খৃষ্টান জাতির ত্রিত্ববাদকে তীব্রভাবে খন্ডন করেছিল। তারা একজন দুর্বল মানুষকে খোদার পুত্র খোদা বলে বিশ্বাস করে এবং তা প্রচার করে। খ্রীষ্টান জাতির ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করলে তারাই যে দাজ্জাল এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে, এমন কোন ছল-বল-কলা-কৌশল অবশিষ্ট রাখে নি, যা প্রয়োগ করতে তারা বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেছে। জলের মত তারা অর্থ ব্যয় করেছে; সাহিত্যের নামে সংস্কৃতির নামে, নগ্ন সভ্যতার বিষাক্ত হাওয়ায় ব্যাধিগ্রস্থ করতঃ বুদ্ধির সাহায্যে কৌশল খাঁটিয়ে নানান ছলে দরদী বন্ধু সেজে, এক আল্লাহ্ এক রসূলে (সঃ) বিশ্বাসী মুসলমান জাতিকে করেছে শতধা বিভক্ত।

যে মুসলমান একজন আরেক জনের ভাই, যাদের জান, মাল এবং ইজ্জত একে অপরের জন্য হারাম। দাজ্জালের চক্রান্তের ফলে তারাই আজ একে অপরের বৈরী সেজেছে। লোভ-লালসা ও ভোগের দিকে আহ্বান করে তাদের করেছে দুনিয়া পাগল। মসজিদের আকর্ষণকে মসনদের আকর্ষণে রূপান্তরিত করেছে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, দাজ্জাল বের হবে, মুসলমানগণ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপোল বিজয় হওয়ার পরে পরেই।" ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত যে, সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ কর্তৃক ১৪৫৩ খৃঃ কনস্টান্টিনোপোল বিজয় হয় যা এখনও মুসলমানদের হাতে আছে। হাদীস অনুযায়ী ঐ বিজয়েরই পরে পরেই দাজ্জালে উৎপাত ও বহির্গমন শুরু হওয়ার কথা। বস্তুতঃ তখন হতেই মুসলমান জাতির ঈমানে ধরে ঘুণ। সেই ঘুণেই আস্তে আস্তে মুসলমান শক্তিকে করে দেয় হীনবল এবং খৃষ্টান শক্তি হতে থাকে ক্রমশঃ প্রবল। আর বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে গ্রাস করতে থাকে মুসলমান রাজ্যগুলো। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে "হিজরী এক হাজার সনের পরে এই জাতি মুসলমান দেশ আক্রমণে বহির্গত হয়ে মুসলমান রাজ্যগুলি আক্রমণ ও দখল করবে" (আহামদ, ইবনে মাজা) খৃষ্টান রাজ্যগুলির কার্য্যকলাপ এবং মুসলমান রাজ্যগুলির চরম দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। হিজরী এক হাজার সনের পরেই রাশিয়া মধ্য এশিয়া দখল করে, জার্মানী ফ্রান্স ও ইতালী আফ্রিকার মুসলমান রাজ্যগুলি গ্রাস করে, বৃটেন ও ফরাসী কোন কোন মুসলমান রাজ্যের সুহৃদ সেজে বসে এবং ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। বর্তমান কালে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও দাজ্জালি ফেৎনাৎ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। পাক কালামে মুসলমান জাতিকে আল্লাহ্তাআলা কঠোরভাবে আদেশ দিয়ে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সকলে মিলে একত্রে আল্লাহ্তাআলার 'রজ্জুকে' শক্তভাবে ধারণ কর, (সাবধান) দলে দলে বিভক্ত হইও না" (আলে ইমরান)। আল্লাহ্র "রজ্জু" অর্থে সূরা নুরে ৭ম রুকূতে বর্ণিত আল্লাহ্তাআলার দেওয়া "খেলাফত" যার পবিত্র আশ্রয়ে মুসলমানগণের একতা ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সংহতি অটুট থাকে। কিন্তু মুসলমানগণ দাজ্জালি ফেৎনার কবলে পতিত হয়ে দজ্জালের ছলা-কলায়, কুরআনের আদেশ-নিষেধ ভুলে গিয়ে, দুনিয়াবীর কামনা-বাসনা, লোভ-লালসায় মদমত্ত হয়ে, বিভিন্ন রাজায় আর রাজ্যে বিভক্ত হয়ে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জন্যে নিজ নিজ স্বার্থে মসনদের জেহাদে মত্ত। পবিত্র কালামে মুসলমান জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ্তাআলা বলেন, হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।" (মায়েদা) কিন্তু মুসলমান দুনিয়ার প্রেমে এমনি অন্ধ হয়ে গেছে যে, সে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান জাতিকে হযরত রসূল করীম (সঃ) 'দাজ্জাল' রূপে চিহ্নিত করে মুসলমানগণকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আল্লাহ্ এবং রসূলের সেই আদেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করতঃ আজ তারা রক্ষা কবচ হিসাবে তাদেরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করছে না। বরং নিজেরাই তাদেরকে আহ্বান জানিয়ে দেবে। তাই পাক কালামে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "বাহ্যিক দর্শনেন্দ্রীয়ের অন্ধতা প্রকৃত অন্ধতা নহে, বরং মানসনেত্রের অন্ধতাই প্রকৃত অন্ধতা। (সূরা হজ্জ)। অন্যত্র বলেছেন, "তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা বুঝবার চেষ্টা করে না, আর তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তদ্বারা দর্শন করতে চায় না, এবং তাদের কান আছে কিন্তু তদ্বারা শ্রবণ করার চেষ্টা পায় না"(সূরা আ'রাফ)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, দাজ্জালের কপালে কাফ্, ফে, রে লিখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত মু'মিনগণ তা পাঠ করতে পারবে।" প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, শিক্ষিতগণ না হয় পাঠ করতে

পারলো, কিন্তু অশিক্ষিতগণ পাঠ করবে কীরূপে ? উপরোক্ত বাণী থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, মানস-নেত্র ব্যতীত বাহ্যিক দৃষ্টিতে দাজ্জালকে চিনা যাবে না। তাকে চিনতে হলে মু'মিন হওয়া প্রয়োজন। আভিধানিকভাবে দাজ্জালের অর্থ বহু মিথ্যাভাষী। সুতরাং এই বহুরূপীকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মু'মিনগণই কেবল চিনে নিতে পারবে, এমন কি প্রকৃত মু'মিন, নিরক্ষর হলেও দাজ্জালকে চিনতে পারবে। তজ্জন্য স্কুল, কলেজ অথবা মাদ্রাসার বড় বড় সনদের প্রয়োজন হবে না। বাহ্যদর্শীদের চোখে দাজ্জালের ছলা, কলা, কৌশল ধরা পড়বে না, বরং পরম বন্ধু বলেই মনে হবে। তাই বর্ণিত আছে যে, দুনিয়াদারীর লোভ, লালসা, কামনা, বাসনার মোহে দাজ্জালী ফেৎনায় পতিত হয়ে, তাদের ছলা কলা ভুলে গিয়ে বহু টুপীধারী ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে। প্রশ্ন থেকে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মু'মিন কারা ? আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর আদেশ-নির্দেশের অধীনে সংঘবদ্ধভাবে একমাত্র দীন ইসলামের খেদমতে যারা নিজেদের জান, মাল, অকাতরে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃতপক্ষে মু'মিন। পাক কালামে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে, পরজগতেও সে অন্ধ থাকবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল) এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, মাতৃগর্ভ থেকে যে ব্যক্তি অন্ধ অবস্থায় জন্মলাভ করবে, পরজগতে সেই ব্যক্তি অন্ধ থাকবে। বরং এ কথার মর্মার্থ ইহাই যে, ইহ জগতে মানস-নেত্র যাদের অন্ধ পরজগতে তারাই অন্ধ থাকেব। মানস-নেত্রের অন্ধত্বের কারণেই দুনিয়াবাসী আজ চরম দুর্দশায় নিপতিত। পবিত্র কুরআন করীমে এইরূপ অবস্থাকে মৃত অবস্থা বলে বর্ণনা করতঃ তাদের উদ্ধারকল্পে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসূল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও" (সূরা আন্‌ফাল)। আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আল্লাহ্র খলীফা ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী ইহাই যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অন্ধকে আঁখি দিয়ে বধিরকে শ্রবণ শক্তি দিয়ে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন করতঃ সঞ্জীবিত করার জন্য বর্তমান যুগে আল্লাহ্তাআলা তাঁকে মনোনীত করেছেন। তিনি এসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে এক জামাত প্রতিষ্ঠা করতঃ খেলাফতবিহীন শতধা বিভক্ত বিশৃংখল মুসলমান জাতিকে ঐক্যের আহ্বান জানান। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আহামদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণই আজ আল্লাহ্র 'রজ্জু' অর্থাৎ খেলাফতের অধীনে সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের জান, মাল অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে, দীন ইসলামের খেদমত করার কাজে বিশ্বে প্রান্তে প্রান্তে তবলীগের কাজে নিমগ্ন। তাদেরই প্রচেষ্টায় বহু ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান ইসলামের অমিয়বারি পান করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছে। হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আখেরী জমানায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করতঃ ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন, ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর বধ করবেন ইত্যাদি। বর্তমান কালে ধর্মের জন্য কেউ আর লড়াই করে না। লড়াই করে মসনদের জন্য। আর, ইসলামে ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ 'লা ইকরাহা ফিদ্দীনে।' আল্লাহ্তাআলা বলেন, "যুক্তি প্রমাণ যাকে ধ্বংস করেছে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।" ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান জাতি যদি যুক্তি ও প্রমাণের লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে, দীন ইসলাম কবুল করতঃ মুসলমান হয়ে যায়, তবে তারা কেউ আর শূকর পোষবে না। এমনিভাবে সারা জগদ্বাসী যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর ঝান্ডাতলে এসে যায় এবং একতা, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি অটুট রেখে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দায় পরিগণিত হয়ে সবাই আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যায়, তবে তো আল্লাহ্র সমগ্র দুনিয়াই আল্লাহ্ওয়ালাগণের। এ কাজের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ কাটা কাটি, হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি ও মারামারি করার কোন প্রয়োজন নেই, তাক্ওয়া নৈতিক-যুক্তি, একতা আধ্যাত্মিক জ্যোতিই যথেষ্ট।

– সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

অমৃতবাণী

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

স্মরণ রাখবেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার জন্য খোদাতাআলার উপর কোন প্রকার মিথ্যারোপ করে এবং কোন স্বপ্ন বা কোন ইলহাম অথবা কাশ্‌ফ আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকের মধ্যে ছড়ায় তা হলে আমি তাকে কুকুরের চাইতেও নিকৃষ্ট এবং শূকর অপেক্ষা অপবিত্র মনে করি এবং উভয় জগতেই তার প্রতি আমি অসন্তুষ্টি ও বিরাগ প্রকাশ করি; কারণ সে অতি হীন মিথ্যাচরণের দরুন এবং তার প্রিয় প্রভুকে মিথ্যারচনার দরুন অসন্তুষ্ট করেছে। যদি আমরা অতি ধৃষ্ট ও চরম মিথ্যাবাদী হয়ে যাই এবং খোতাদাআলার সামনে মিথ্যাচরণ ও মিথ্যারচনা করতে ভয় না করি তাহলে কুকুর এবং শূকরও আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণ ভাল। সুতরাং যদি পাপ করে থাকো তা হলে তওবা কর যেন ধ্বংস না হও। নিশ্চিতভাবে বুঝে নাও যে, খোদাতাআলা মিথ্যারচনা-কারীকে কখনো শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। প্রকৃতপক্ষে এই অধমের দাবী-দাওয়া ও কার্যকলাপ কোন মানুষের সাক্ষ্য প্রদানের উপর নির্ভর করে না। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আছেন এবং তাঁর সঙ্গে আমি আছি ; তিনিই আশ্রয়স্থল হিসাবে আমার জন্য যথেষ্ট; তিনি নিজ বান্দাকে কখনো ধ্বংস করবেন না; তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে কখনো বিনাশ করবেন না। এই হলো সেই সব কথা যা কয়েকবার মিঞা করীম বখশকে কয়েকটি মজলিসে বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি এসব কথা শুনে এক বিষাদপূর্ণ অন্তরে এমন উত্তর দিলেন যা শুনে কান্না আসছিলো এবং তাঁর এক একটি শব্দ দ্বারা মনে হচ্ছিল যেন তিনি খোদার ভয়ে অভিভূত ও পরাভূত হয়ে পরম সততার সাথে এসব কথা বর্ণনা করছিলেন। তাঁর বিবরণের মধ্যে, যা তিনি অশ্রু-সিক্ত নয়নে ও আবেগাপ্লুত অবস্থায় ব্যক্ত করছিলেন, এমন মর্মস্পর্শী প্রভাব ও ক্রিয়া শক্তি প্রকাশমান ছিল যার প্রভাবে দেহে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছিল। সুতরাং ঐ দিন দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চয়তার সাথে উপলব্ধি করা হলো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও ধমনীতে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এর দরুন তার ঈমানের উন্নতি ও উপকার লাভ হয়েছে। অতএব আমরা নিম্নে তাঁর সেই বিজ্ঞাপনটি উল্লেখ করবো যা তিনি পরম মর্যাদাশালী খোদার কসম খেয়ে বেদনাপূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে লিখেছেন, ইহা পাঠ করলে বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণগণ এবং প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনকারীগণ অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, উহা কত উচ্চ মানের সাক্ষ্য ! (চলবে)

(নিশানে আসমানী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ)

আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,
সদর মুরব্বী

আমরা কেন আহমদী হয়েছি
আহমদীয়তের সত্যতার নয়টি প্রমাণ

আহমদীয়তের সত্যতার বহু নিদর্শন আছে। এগুলো সেলসেলার পুস্তক-পুস্তিকা ইশতেহার ও পত্র-পত্রিকায় বহুলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মোটামুটি এগুলো সংখ্যায় সহস্রাধিক তন্মধ্যে মাত্র ৯টি নিদর্শন বর্ণনা করার চেষ্টা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। পৃথিবীতে বর্তমানে বহুধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেই আবার রয়েছে বহু সম্প্রদায় উপ-সম্প্রদায়। ইহুদী ধর্মে যেমন ৭২টি ফেরকা হয়েছিল; অনুরূপভাবে সর্বশেষ ধর্ম ইসলামেও সৃষ্টি হয়েছে ৭৩টি ফেরকা। এ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে আমরা কেন আহমদীয়ত গ্রহণ করেছি। এই ধরুন আমি একজন হানাফী ফেরকার যুবক ছিলাম। ঐ সমাজে থাকাকালীন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান (৭২ সনে) হবার সুবাদে স্থানীয় স্কুল, ডাকঘর, রাস্তাঘাট, তৈরীসহ বেশ কিছু সমাজমূলক কাজ করেছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, বোদা, ঠাকুরগাঁও এলাকায় বেশ কিছুদিন ছিলাম। পঞ্চগড়ের বুকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর তা তখন জানতাম না। ১৯৭৪ইং সনে বৈবাহিক সূত্রে আমার আহমদীয়ত গ্রহণ এবং পরবর্তীতে নিউসোনাতলা জামাত প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি বিষয়গুলো আমার জীবনের বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে। যাহোক, আহমদীয়তের সত্যতার ৯টি প্রমাণ উল্লেখ করার কথা এ লেখার শুরুতে বলেছিলাম তা এখানে অতি সংক্ষেপে পেশ করা হলো ঃ

প্রথম প্রমাণ ঃ মোজাদ্দেদ এর আগমন

সহী হাদীসে এসেছে প্রতি হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে মোজাদ্দেদ আসবেন। আহমদীগণ হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দীতে মোজাদ্দেদ দেখিয়েছে। ইসলামের বাকী সব ফেরকা বিগত সারাটা হিজরী শতাব্দীতে মোজাদ্দেদ দেখায়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর বিখ্যাত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ যুগের চিহ্নাবলী প্রকাশ

হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদীয়ে আখেরি জামানা সংক্রান্ত কুরআন, হাদীস ও আত্তলিয়াগণ বর্ণিত সমুদয় লক্ষণাদি এ যুগে পূর্ণ হয়েছে। এ সমস্ত লক্ষণ দ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দীয়ে আখেরী জামানা জাহির হয়েছেন প্রমাণিত হয়। কাজেই আমরা সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছি। চিহ্নাবলী বা লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) বহু ভূমিকম্পন (২) প্লেগ-ব্যাধি বিস্তার লাভ করা (৩) নির্ধারিত তারিখে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ (৪) পাহাড় বিক্ষিপ্ত হওয়া (৫) মরুভূমিতে উষ্ট্র বেকার হওয়া (৬) বহুল পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকাসহ আধুনিক মিডিয়াসমূহ আবিষ্কার করা যেমন রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইট টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি। (৭) ইস্রায়েল রাষ্ট্র কায়েম হওয়া (৮) নদ-নদী শুষ্ক হওয়া (৯) বনের জীব-জানোয়ার চিড়িয়াখানায় স্থান লাভ করা (১০) পুরুষেরা নারীর বেশ ধারণ এবং নারীরা পুরুষের বেশ ধারণ করছে অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন হওয়া (১১) গায়িকার চাহিদা বৃদ্ধি (১২) অখন্ড আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া (১৩) তরল স্বর্ণ (Liquid oil) অর্থাৎ তেল আবিষ্কার হওয়া।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে আগমনকারীর সময় কাল পূর্ণ

পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যেমন (১) তৌরিতে তাঁর আবির্ভাব কাল ১২৯০ হতে ১৩৩৫ হিজরী নির্ধারিত করা হয়েছে (২) বাইবেলে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে– ক) জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব হবে খ) রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সংঘর্ষ, গ) জেরুজালেম সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হবে, ঘ) মহা মারীর প্রাদুর্ভাব, ঙ) ভূমি-কম্পের প্রাচুর্য ঘটবে। এখানে উল্লেখ্য যে, তৌরিত ও বাইবেল বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে।

৪র্থ প্রমাণ - প্রতিশ্রুত ব্যক্তির উপর অজস্র ঐশীবাণী

আকাশ ও পৃথিবীর সাক্ষ্য এবং মু'জিযা বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু এলহামী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যেমন -

১। প্লেগ এবং এইডস্ সম্বন্ধে

২। ভূমিকম্প সম্বন্ধে

৩। জারের পতন সম্বন্ধে

৪। আফগানিস্তান সম্পর্কে

৫। কোরিয়াবাসী এবং জাপানের অভ্যুদয় সম্পর্কে ইত্যাদি বহু বিষয় সম্পর্কে ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

৫ম প্রমাণ – বর্তমান যুগে নবী এবং বহুল পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্তি হয়ে পূর্বাহ্নে জ্ঞাতকরণে

যুগের নবীকে অস্বীকার করলে অতীতের সকল নবীকে অস্বীকার করা হয়। আঁ হযরত (সঃ)-এর উম্মত থেকে উত্থিত একজন উম্মতী নবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার সহস্র সহস্র ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। বহুল পরিমাণ গায়েবের সংবাদ তিনি (আঃ) জ্ঞাত হয়ে মানব জাতিকে পূর্বাহ্নে জানিয়েছেন

ষষ্ঠ প্রমাণ – ইসলাম প্রচার

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে আজ কোন্ জামাতের লোকজন দিন-রাত ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ? খ্রীষ্টানগণের বিরুদ্ধে আজ কোন জামাত খাড়া হয়েছে। খ্রীষ্টানগণের আক্রমণ হতে কোন্ জামাত ইসলামকে সঠিকভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করছে ? মদীনার মাটিতে হুযূর পাক (সঃ)-কে শায়িত্ব রেখে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে জিন্দা রাখার বিষয়টির বিরুদ্ধে কোন্ জামাত সোচ্চার ? উল্লেখিত সকল প্রশ্নের উত্তরে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতকেই দাঁড় করানো সম্ভব। পৃথিবীর ১৫৮টি দেশে কয়েক হাজার মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ডিশ্ স্যাটেলাইট। (MTA) চ্যানেলের মাধ্যমে দিন রাত ইসলাম প্রচার করছে এই ক্ষুদ্র জামাত, ৫২টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১০০টি ভাষায় ইতঃ -পূর্বে কয়েকটি সূরার সমন্বয়ে আংশিকভাবে কুরআন করীমের অনুবাদ ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। ৮৯টি ভাষায় তরজমার, কাজ বিভিন স্তরে রয়েছে। জার্মানীতে ১০০টি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অসংখ্য হাস-পাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আহমদী জামাত কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান শতাব্দীতে ইসলাম তথা আহমদীয়তের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য সারাবিশ্বের বিভিন্ন জাতি থেকে ১৯,১৪৩ জন (প্রতিদিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে) শিশু জীবন

উৎসর্গকারী স্কীম "ওয়াকফে নও" এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিগত আন্তর্জাতিক বয়াত বছরগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিবর্গ থেকে সাদা-কালো, বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু খ্রীষ্টান নাস্তিক সম্প্রদায় থেকে দলে দলে মানুষ আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামে দাখিল হচ্ছে। সংক্ষেপে সন-ওয়ারী একটি চিত্র দেওয়া গেল ঃ ১৯৯৩ ইং সনে – ২০৪৩০৮ জন, ১৯৯৪ইং সনে ৪,১৮২০৬ জন, ১৯৯৫ইং সনে ৮,৪৫,২৯৪ জন ১৯৯৬ইং সনে ১৬,০৬৭২১ জন, ১৯৯৭ইং সনে ৩০,০৪৫৮৪ জন ১৯৯৮ ইং সনে ৫০,০৪০০৬ জন এবং ১৯৯৯ইং সনে ১,০৮২০,২২৬ জন। আহমদীয়া জামাতের মহান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) এ বছর শুধু ভারতে ১ কোটি পথ হারা মানুষকে জিন্দা খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য টার্গেট দিয়েছেন।

৭ম প্রমাণ – একীন ও ঈমানের স্বাদ

আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব সম্বন্ধে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের যেমন ঈমান ও একীন তদ্রূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ এবং তাহার খলীফাগণের সত্যতা সম্বন্ধেও ঈমান ও একীন রয়েছে। যেহেতু আহমদীয়ত গ্রহণের ফলে আমাদের উপর বিরোধিতার চরম ঝড় নেমে আসে, সামাজিক বয়কট শুরু হয়ে যায়। নিকটাত্মীয়গণ দূরে সরে চলে যায়। ফলে ঈমানের নতুন স্বাদ প্রত্যেক আহমদীকে গ্রহণ করতে হয়। অনেকের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়। আহমদীয়তের ইতিহাসে হাজারো ব্যক্তির শাহাদৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। অতি সাম্প্রতি (৮ই অক্টোবর '৯৯) বাংলাদেশের খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে ৭ জন আহমদী ভ্রাতা শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন। "এরাই ঐ সকল লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশীষ ও করুণা বর্ষিত হয় আর এরাই হেদায়তপ্রাপ্ত।" শুধ খুলনায় নয় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া) তেবাড়িয়া (নাটোর) চড়াইখোলা (সৈয়্যদপুর) গাইবান্ধা পূর্ব মদনের পাড়া, রাংটিয়া (বকশীগঞ্জ জামালপুর), নিউসোনাতলা (বগুড়া) প্রভৃতি জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীগণ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আক্রমণের শিকার। আহমদীয়ত গ্রহণের কারণে তাদেরকে এ নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা যদি আহমদীয়ত ত্যাগ করি তবে ঈমান ও আধ্যাত্মিক আস্বাদ আমরা কোথাও পেতে পারি না।

৮ম প্রমাণ – আহমদী ও অ-আহমদী প্রভেদ ঃ

আমলের দিক থেকে আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতা ও তাঁর খলীফাগণের আধ্যাত্মিকতা অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে এই সাহায্য প্রদান করে চলেছে। এ জামাতে এরূপ বহু সংখ্যক লোক আছেন যাঁদের দোয়া কবুল হয় এবং যাঁরা খোতাদাআলার ইলহাম ও কাশফ্ দ্বারা সম্মানিত হয়ে আসছেন। তৌহীদের আমলী বা বাস্তব ও কার্যকর ঘোষণার মাধ্যমে যেভাবে এবাদত করার প্রয়োজন সেইভাবে আহমদীগণ তা করে থাকে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত উপাস্যকে নাস্তি করাই আহমদীদের বৈশিষ্ট্য। একারণে তারা তাদের জান, মাল (বায়তুল মালে) সময় ইজ্জত কুরবানী দিতে সদা আগ্রহী। এ নেতৃত্বের (যুগ-খলীফা) অধীনে এ নেযামের শৃংখলে আগমদীগণ আবদ্ধ। অ-আহমদীদের মধ্যে এ সকল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত।

৯ম কারণ – নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণ ঃ

'ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াতুন – নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই 'ইখওয়ানুকুম ফিদ্দীন' – তোমরা দীনি ভাই। পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত দৃষ্টি-ভঙ্গীর কারণে এবং "বিশ্বাসীগণ একটি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমতুল্য" হাদীসের আলোকে এক মুসলিম ভাইয়ের অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। আহমদীগণই একমান বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব (International brotherhood) কায়েম করেছে। একে অন্যের দুঃখে শামীল থেকে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণ করছে। দেশে দেশে বিভিন্ন সমাজের আহমদীগণ একটি দেহের ন্যায় কাজ করছে। তাদের পরস্পর সুখ-দুঃখে সকলে শামিল। একমাত্র যুগ-খলীফা থাকার কারণে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া আহমদীগণ বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সকলের রূহানী মঙ্গলের জন্য দোয়া করে। বিশ্ব মানবের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি সম্পন্ন আচরণ করে। আহমদীগণই একমাত্র সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে আগমনকারী নবী-রসূল অবতারগণকে আল্লাহ প্রত্যাদিষ্ট হিসাবে মান্য করে। আমরা এ যুগের সমুদয় ধর্ম ও ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট বিনীত আবেদন করছি যে, তারা আপন আপন ধর্ম বা ধর্ম-সম্প্রদায় (Sects) হতে উপরোল্লিখিত ৯টি (নয়) বিষয় একত্রীতভাবে প্রদর্শন করুন।

– অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ

হে খোদা ! ঐ সকল ফেরাউনদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন কর, যারা ক্রমাগত অহঙ্কার, দম্ভ ও মিথ্যাচারিতায় পূর্বের চেয়েও অধিকমাত্রায় বেড়ে গিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ দিতে শুরু করেছে এবং যুলুম অত্যাচার ও নির্লজ্জতা থেকে বিরত হচ্ছে না।

একশ' বছর পূর্বে লেখরাম চরম শিক্ষণীয় ঐশী নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল, আজ একশ' বছর পর আবার লেখরামদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার জন্য আপনাদেরকে আমি দোয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। *- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)*

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

দেন। আমি আমার জন্যে বলছি না। কেননা, এ জামাত খোদার জামাত, এজন্যে যার নিকটেই খোদাতাআলা এ জামাতের ভার অর্পণ করবেন তাকে সেই প্রকার শক্তি ও সামর্থ্য দিবেন (এই বলে) যে, আজ যাদেরকে দুর্বল দেখা যাচ্ছে তাদের হাতেই বিজয় লাভ হবে। তারা নিজেদের আত্মার ওপরে কু-ধারণা পোষণ করে করুক কিন্তু আমার সু-ধারণা আছে আর ইনশাআল্লাহ্তাআলা ঐ দিন আসবে যখন আমার সু-ধারণা পূর্ণ হয়েই থাকবে।

পুনরায় আমি বলছি, যদি আর্থিক খরচাদি আমাদের জামাতের লোকদের নিকট বোঝা বলে মনে হয় তাহলে বন্ধুরা কেন তবলীগের ওপরে বিশেষ দৃষ্টি দেন না। আমি কবে তাদেরকে বাধা দিয়েছি যে, তারা জামাতকে যেন বৃদ্ধি দান না করেন।' তারা সত্বর কেন জামাতকে বাড়াচ্ছেন না যেন এ ভার লাঘব হয়। ইহা আমাদের ত্রুটি নয় বরং স্বয়ং তাদেরই ত্রুটি। আপনারা যদি জামাতকে বাড়ান তাহলে আর্থিক বোঝা অবলীলায় হ্রাস পাবে। মোট কথা আসল কথা তো ইহাই যে, মু'মিনের বোঝা মৃত্যুর পরই কম হয়ে থাকে, জীবদ্দশায় হতে পারে না।

এ উপলক্ষ্যে আমি বন্ধুগণকে এ শুভ সংবাদও শুনাতে চাই যে, এ বছর দু'টি দেশে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঐ দেশ দু'টোর মধ্যে একটিতে যেখানে খৃষ্টানরা ১০০ বছর ধরে তবলীগ করেছিলেন তার পরে গিয়ে তাদের কিছু সফলতা লাভ হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের মুবাল্লেগগণের কয়েকদিনের চেষ্টা ১৫-১৬ জন পবিত্রাত্মা মিলে গেছে। উহা সুমাত্রা ও জাভা এলাকায় অবস্থিত। অন্য আর একটি দেশ রয়েছে যার নাম নিবার সময় আমরা রক্তে নাচন লাগে। উহা হলো ইরান। ইরান ঐদেশ যার সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের সম্পর্ক আছে। কেননা, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মসীহ্ পারশ্য বংশোদ্ভুত হবেন। ইরানের রাজধানীর ২০ জনের মত লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করেছেন। আর তাদের প্রসঙ্গে আরও খুশীর সংবাদ এই যে, সেখানে আমাদের যে মোবাল্লেগ গেছেন তাকে আমরা কোন খরচ দিই না। তিনি শাহযাদা আব্দুল মজীদ সাহেব। তিনি শাহ্ শুজা-এর বংশধর এবং লুধিয়ানার বাসিন্দা। তিনি ধর্মের সেবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমি তাকে ইরানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার সদ্য পত্র থেকে জানা যায় যে, এমন কতক লোক আহমদীয়ত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন যারা প্রভাবশালী ও সম্মানীত এবং হাজার হাজার লোকদের ওপরে যাদের প্রভাব আছে।

আরও একটি কথা আমি শুনাতে চাই যাতে ইহা ধারণা করা যায় যে, খোদাতাআলা কীভাবে আমাদের জামাতকে তবলীগ করাচ্ছেন। গত বছর তুর্কীস্তানে কুর্দ্দীদের যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিলো তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ সাঈদ নামক এক ব্যক্তি। উহা এত বড় বিদ্রোহ ছিলো যে, উহাকে দমন করার জন্যে তুর্কীদের ৩ লাখ লোককে সমবেত করতে হয়েছিলো। আর প্রধানমন্ত্রী ইসমত পাশার ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিকে তাদের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিলো। শেখ সাঈদকে যখন ধরা হলো আর বিবৃতি নেয়া হলো তখন তিনি বল্লেন, যদি অমুক ঘটনা না ঘটতো তাহলে আমি কখনও বিদ্রোহের পথ বেছে নিতাম না। কেননা, আমি মন স্থির করেছিলাম যে, আমি হিন্দুস্থানে চলে যাবো এবং জামাতে আহমদীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে তবলীগ করবো। যদিও তুর্কীরা তাকে হত্যা করে ফেলে এবং তিনি তার আশা পূরণ করতে পারলেন না। কিন্তু এতদ্দ্বারা ধারণা করা যায় যে, ঐ দেশের বড় বড় লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করেছেন। আমার দুঃখ লাগে যে, এ ব্যক্তি জামাত সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা রাখতেন না নচেৎ তিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতেন না।

আমি আর্থিক সংকটের কথা বলেছি ঐ সময় পর্যন্ত। কোন নতুন কাজ যেন বাড়ানো না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা ঠিক হয়। আমেরিকার মিশনের জন্যে এখন খরচ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আগামী বছর থেকে হিন্দুস্থানে বেশী বেশী প্রচেষ্টা চালানো হবে যেন এখানকার জামাত অধিক বৃদ্ধি পায় এবং অধিক বোঝ বহন করতে সক্ষম হয়। যেখানে ইহা আবশ্যক যেন আমাদের জামাত বেশী বেশী আর্থিক কুরবানী করে সেখানে ইহাও আবশ্যক যে, যেসব জিনিষ দ্বারা তারা কুরবানী করতে পারে তা-ও যেন বৃদ্ধি করা হয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে-সোনার ডিমের জন্যে মুরগীকে মেরে ফেলা উচিত নয়। এজন্যে জরুরী যে, জামাতের আর্থিক সংশোধন ও উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা হোক। এজন্যে একেতো ইহা আবশ্যক যে, জামাতের লোকেরা একে অন্যের সাথে সহায়তা করে, বিভিন্ন স্থানে ট্রাঙ্ক-সুটকেস তৈরী, কালি তৈরী, লুঙ্গি তৈরী ইযারবন্দ বা ফিতা তৈরী, কুলাহ্ বা পাগড়ীর মধ্যের টুপি প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প তৈরী হচ্ছে। যদি বিভিন্ন স্থানের আহমদী ব্যবসায়ী আহমদী কারিগর থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করে তাহলে তাদের বিক্রী প্রসার লাভ করতে পারে। আর তাদের আয় বেশী হওয়ার কারণে জামাতের লাভ হতে পারে। অতএব আহমদী ব্যবসায়ী আহমদী কারিগর থেকে মালামাল ক্রয় করুন এবং আহমদী খরিদ্দার আহমদী দোকান্দার থেকে জিনিষপত্র ক্রয় করুন। তাহলে এভাবেও অনেক উপকার হতে পারে। আমাদের মোবাল্লেগগণকে এ কাজে সাহায্য করা উচিত। যেখানেই যান দেখুন যে, কোন আহমদীর কোন্ শিল্প কারখানা আছে। আর যখন অন্য স্থানে যান তখন সেখানকার লোকদের বলুন যে, অমুক আহমদী অমুক দ্রব্য তৈরী করেন তাথেকে ক্রয় করুন।

আমার দৃষ্টিতে এ প্রসঙ্গে সফলতা দানের সহজ পদ্ধতি ইহাও যে, মজলিসে শূরার সময়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয় যাতে আহমদী কারিগর- শিল্পী নিজেদের তৈরী জিনিসপত্র নিয়ে এসে দেখায় যাতে বন্ধুগণ অবহিত হয়ে যায় যে, অমুক জিনিষ অমুক স্থান থেকে পাওয়া যেতে পারে। এবং প্রয়োজনের সময়ে সেখান থেকে আনিয়ে নেয়। আবার আহমদীদের উচিত বেকার আহমদীদের চাকুরী প্রদানে চেষ্টা করা। কতক বন্ধু এ ব্যাপারে খুবই সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই শিথিল, তা প্রদর্শন করেন এভাবে জামাতের লোকদের উচিত শিল্প-বাণিজ্য প্রধান নগরগুলোতে গিয়ে ব্যবসা ও শিল্পকর্ম শিখে।

এভাবে একটি জরুরী বিষয়ে হলো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে সাহায্য করা। যখন আমরা বলি যে, সব কিছু ধর্মের জন্যে কুরবানী করে দাও তখন যারা এর ওপরে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উত্তরাধিকারী-গণের জন্যে কিছুই থাকে না। এমন অভাবী লোকদের জন্যে একটি তহবিল গঠন করা জরুরী। এতে চাঁদা দেয়া অবশ্য কর্তব্য নয়, তবে স্বেচ্ছাধীন। আর এর জন্যে এমন নিয়ম বেঁধে দেয়া দরকার যে, যারা এত চাঁদা দিবেন তাদেরকে এতদিন পরে এত পরিমাণ নির্ধারিতভাবে দেয়া হবে বা যদি মারা যান তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণকে এত টাকা আদায় করে দেয়া হবে।

এখন আমি ঐ বিষয় শুরু করছি, যে ব্যাপারে আমি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি। আমার অন্তরে দীর্ঘদিন থেকে এ ইচ্ছা ছিলো যে, এ বিষয় বলি। ইহা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, প্রত্যেক মানুষের মনে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর অসংখ্য লোক এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে এবং এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থা পত্র যাচ্ঞা করেছে। ঐ প্রশ্নটি এই যে, উহা কোন্ উপকরণ (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

'তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তকের উপর আলোচনা

এমটিএতে প্রচারের জন্য আমাকে বাংলাদেশ এমটিএ বিভাগ কর্তৃক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রচিত পুস্তক 'তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন' এর উপর কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলোর উত্তর নিম্নে দেয়া হলো। যারা পুস্তকটি পড়ার সুযোগ পান নি তারা এ প্রশ্ন-উত্তরগুলোর মাধ্যমে পুস্তকটির মূল বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করে উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

প্রথম প্রশ্ন ঃ 'তাযাকেরাতুশ শাহাদাতাইন' পুস্তকে মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যে দু'জন শহীদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের নাম, সামাজিক মর্যাদা এবং এই পুস্তকটি রচনার পটভূমি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তরঃ 'তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তকে হযরত মসীহে মাউওদ (আঃ) যে দু'জন শহীদের উল্লেখ করেছেন তাদের প্রথম জন হলেন মিয়া আবদুর রহমান ও দ্বিতীয়জন হলেন কাবুলের খোস্ত এলাকার মহান নেতা সাহেবযাদা হযরত মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব।

সাহেবযাদা হযরত আবদুল লতীফ সাহেবের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলতে হয়- তিনি ছিলেন এরূপ একজন মর্যাদাশালী ব্যক্তি, কাবুলে যাঁর কয়েক লক্ষ টাকার জায়গীর ছিল। এতো সেকালের হিসাব অনুযায়ী, অর্থাৎ ১৯০৩ সালে যখন তাঁকে শহীদ করা হয়, আজকের টাকার অংকে এ জায়গীরের মূল্য নিশ্চয় কয়েক কোটি টাকা হবে। তাছাড়া ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষেও তাঁর অনেক জমি ছিল। অন্যদিকে জ্ঞান ও তাক্ওয়ার ঐশ্বর্যের দরুন তিনি ছিলেন সমগ্র কাবুল ভূখন্ডের নেতা। কাবুল রাজ্যে তাঁর প্রায় ৫০ হাজার শিষ্য ও ভক্ত ছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক বড় বড়, কর্ম-কর্তা। 'মৌলভী' পদ ছাড়াও তিনি আফগানিস্তানে 'সাহেবযাদা', 'শাহযাদা' ও আখুন্দযাদা', উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞানের দিক থেকে তাঁকে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম মনে করা হতো। এমনকি আফগানিস্তানের নূতন আমীরের অভিষেক অনুষ্ঠানও তাঁর হাতে সম্পন্ন হতো। আমীরের মৃত্যু হলে তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য তিনিই মনোনীত হতেন। অতি সংক্ষেপে বলতে হয় তিনি প্রায় ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত অতি সম্মানের সাথে সুখ-সম্পদের মধ্যে বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করেন।

অপর শহীদ মিয়া আবদুর রহমানের দীর্ঘ পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি ছিলেন হযরত সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেবের সুযোগ্য এক শিষ্য।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর 'তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তকটি রচনার পটভূমি হচ্ছে এরূপ–তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া'এর ৫১১ পৃষ্ঠায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করেন। ভবিষ্যদ্বাণীটির বাংলা অর্থ হচ্ছেঃ "তোমার জামাতের দু'টি ছাগলকে যবাই করা হবে।" খোদাতাআলার কিতাবের বাগ্ধারা অনুযায়ী নির্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ছাগলের সাদৃশ্য করা হয়ে থাকে। এমনি আমরা যে দু'জন শহীদ সম্পর্কে বললাম. এ ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল তাঁদের সম্পর্কে। ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয় 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ লেখার ২৩ বৎসর পর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দু'টি কারণে 'তায্কেরাতুশ শাহাদাতাইন' পুস্তকটি রচনা করেন। তিনি এই পুস্তকের সূচনাতেই বলেন, "এ যুগে যদিও আকাশের নীচে সর্বপ্রকারের যুলুম-অত্যাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তথাপি এখন আমি যে যুলুমের বিবরণ দিব তা এরূপ একটি মর্মান্তিক ঘটনা, যা হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং দেহকে প্রকম্পিত করে তোলে"। দ্বিতীয়তঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "খোদার কসম করে বলছি, আমার সাথে যখন সাহেবযাদা আবদুল লতীফের সাক্ষাৎ হলো আমি তাকে আনুগত্যে ও আমার দাবীর সত্যায়নে এত আত্মবিলীনকারী দেখলাম যে, এর চেয়ে অধিক আত্ম-বিলীনকারী হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়"। তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে সত্য মসীহ ও মাহদী জেনেই তাঁর হাতে বয়াত হন এবং তাঁর সত্যায়নে ভয়ঙ্কর যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বীয় ধন-সম্পদ, প্রিয় সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়তমা স্ত্রী, মান-সম্মান সব কিছু তৃণবৎ বিসর্জন করে এক মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, তার এহেন মৃত্যু বরণ আমার সত্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মিয়া আবদুর রহমানের মৃত্যুবরণও তদনুরূপ। এ সকল কারণেই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তকটি রচনা করেন। তদুপরি এ দু'টি শাহাদতের মাধ্যমে হযরত মসীহ (আঃ)-এর ২৩ বৎসর পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ- সাহেবযাদা মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মিয়া আবদুর রহমান সাহেবের শাহাদতের ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ- মরহুম মৌলবী সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের আনুমানিক ২ বৎসর পূর্বে তাঁরই আদেশে ও ইঙ্গিতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মিয়া আবদুর রহমান দু'তিন বার কাদিয়ানে আসেন। অবিরাম সংস্পর্শ ও যুক্তি-প্রমাণ শুনার ফলে তার ঈমানে শহীদের রঙ ধারণ করলো। ঘটনাক্রমে তার কাদিয়ান অবস্থান কালে জেহাদ নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, এ জামাত জেহাদের বিরোধী। কাবুলে ফিরে গিয়ে তিনি যত্রতত্র এ কথা বলতে আরম্ভ করেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে এ সংবাদ কাবুলের আমীর আবদুর রহমানের নিকট পৌঁছে গেল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে মিয়া আবদুর রহমানকে বন্দী করেন। অবশেষে এ কথা সত্য প্রমাণিত হলো যে, ইনি জেহাদের বিরোধী এবং মসীহ কাদিয়ানীর মুরীদ। তখন এই মযলুমকে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে শহীদ করা হয়।

এতো গেল মিয়া আবদুর রহমান শহীদের কাহিনী। এখন মৌলবী সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের বেদনাদায়ক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি।

ঘটনাক্রমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি পড়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা বুঝতে মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেবের ন্যায় বুযর্গের কোন কষ্ট হলো না। এমতাবস্থায় মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে কাদিয়ানে এসে সাক্ষাৎ না করে দূরে বসে থাকা তাঁর জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়লো। তাই তিনি কাবুলের তৎকালীন আমীর হাবীব উল্লাহ খানের নিকট হজ্জে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আমীরের অনুমতি পেয়ে তিনি কাদিয়ান পৌঁছেন। কাদিয়ানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সংস্পর্শে কয়েক মাস থাকার দরুন তাঁর হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারলো না। কারণ ইতোমধ্যেই হজ্জের সময় ফুরিয়ে গেল। তাই তিনি ইংরেজ শাসিত এলাকায় অবস্থান করে কাবুলে প্রবেশের জন্য আমীরের অনুমতি চাইলেন। আমীর প্রতারণাপূর্বক তাঁকে অনুমতি দিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা পূর্ব থেকেই আমীরের মেজাযকে অত্যন্ত বিগড়িয়ে দিয়েছিল। তাই কাবুলে প্রবেশের সাথে সাথে আমীর তাঁকে অপাদমস্তক শিকলে আবদ্ধ করে যে দূর্গে স্বয়ং আমীর থাকেন সে দূর্গে বন্দী করে রাখেন। এই শিকলের ওজন ছিল ১ মনের অধিক। এ শিকল ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত বেষ্টিত ছিল। এ ছাড়াও তাঁর হাতে হাত কড়া লাগালো হয়েছিল।

পায়েও ৮সের ওজনের শিকল পরিয়ে দেয়া হলো। এ জেলখানা ছিল একটি ভয়ঙ্কর জেলাখানা, যাকে মানুষ মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য মনে করে। এ নরকরূপ জেলখানায় তিনি ৪ মাস ছিলেন। এ সময় আমীর তাঁকে কয়েকবার ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি যদি এ ধারণা পরিত্যাগ করে যে, কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ তবে তোমাকে মুক্ত দেয়া হবে। প্রতিবারই তিনি এই উত্তর দেন যে, আমি জানি এ ধারণা পরিত্যাগ না করলে আমার জীবন বিপন্ন হবে এবং আমার পরিবার পরিজন ধ্বংস হবে। তথাপি আমি আমার ঈমানকে আমার প্রাণ ও সকল পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর শ্রেয় মনে করি।

অতঃপর ৪ মাস জেলে অতিবাহিত করার পর আমীর শহীদ মরহুমকে নিজের কাছে ডাকেন এবং সাধারণ দরবারে তাঁকে তওবা করার জন্য আহ্বান জানান। আমীরের তওবার এই আহ্বানও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর বিরোধী আলেমগণের সাথে শহীদ মরহুমের বাহাসের ব্যবস্থা করা হ'ল। বিতর্কের সময় খুব জনসমাগম হয়েছিল। কিন্তু বিতর্ক লিখিত ছিল বিধায় দর্শকরা কিছুই শুনতে পায় নি। এই প্রতারণাপূর্ণ বাহাসে শহীদ মরহুমের উপর কুফরীর ফতওয়া লাগানো হয় এবং তাঁকে শৃংখলিত অবস্থায় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর আমীর স্বয়ং এজলাসে বসেই শহীদ মরহুমকে ডাকেন এবং বলেন, আপনার উপর কুফুরীর ফতওয়া লেগে গেছে। এখন বলুন, তওবা করবেন না কি শাস্তি ভোগ করবেন? এবারও শহীদ মরহুম খুব স্পষ্ট ভাষায় তওবা করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর আমীরের নির্দেশে শহীদ মরহুমকে নাক ছিদ্র করে তাতে রশি ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ রশির সাহায্যে শহীদ মরহুমকে টেনে বধ্যভুমিতে অর্থাৎ সঙ্গেসার কব্বার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা পথে তাঁকে হাসি-বিদ্রূপ, গালি-গালাজ ও অভিসম্পাত দেয়া হয়। শহরের হাজার হাজার মানুষ এই তামাশা দেখার জন্য গেল। বধ্যভূমিতে পৌছার পর শাহযাদা মরহুমকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে দেয়া হয়। এ অবস্থায়ও আমীর তাঁকে তওবার শেষ সুযোগ দিলেন। কিন্তু শহীদ মরহুম পূর্বের ন্যায়ই তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আমীরের নির্দেশে কাযী তাঁর উপর একটি পাথর নিক্ষেপ করেন। এ পাথরেই শহীদ মরহুমের গর্দান ঝুঁকে পড়লো। অতঃপর হতভাগ্য আমীর নিজের হাতে পাথর নিক্ষেপ করে। তার অনুসরণে শহীদের উপর হাজার হাজার পাথর নিক্ষিপ্ত হলো। এত পাথর নিক্ষেপ করা হলো যে, শহীদ মরহুমের মাথার উপর পাথরের একটি টিবি জমা হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী ও তাঁর এতীম শিশুগণকে গ্রেফতার করে খোস্ত হতে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও পীড়াদায়ক শাস্তির মধ্যে সশস্ত্র পাহারধীনে অন্যত্র প্রেরণ করা হলো।

এ পর্যায়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর 'তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতইন' পুস্তকে বলেন, "শাহযাদা আব্দুল লতীফের জন্য যে শাহাদত নির্ধারিত ছিল তা পূর্ণ হলো। এখন যালেমের শাস্তি বাকী রয়েছে। নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম"। তিনি আরো বলেন, "হে আব্দুল লতীফ! তোমার উপর হাজার হাজার রহমত। তুমি আমার জীবদ্দশায়ই স্বীয় সত্যবাদিতার নিদর্শন প্রদর্শন করেছ।" হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরো বলেন, "হে কাবুলের ভূমি! তুমি সাক্ষী থাক। তোমার উপর দাঁড়িয়ে মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত করা হয়েছে। হে হতভাগ্য ভূমি! তুমি খোদার দৃষ্টিতে হীন হয়ে গেছ। কেননা, তুমি এই ভয়নাক যুলুমের স্থান।"

চতুর্থ প্রশ্নঃ শহীদের সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন শরীফে কি বলা হয়েছে ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সাহেবযাদা মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদত সম্পর্কে এই পুস্তকে কি বলেছেন?

উত্তর ঃ- শহীদের সম্পর্কে সূরা আল্ ইমরানের ১৭০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "যাদেরকে আল্লাহ্র পথে হত্যা করা হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। তারাতো জীবিত।"

মরহুম শহীদ যখন নিশ্চিতভাবে জেনেছিলেন যে, তাঁকে হত্যা করা হবে তখন তিনি বলেছেন, "নিহত হওয়ার পর ছয় দিনের মধ্যে আমি আবার জীবিত হয়ে যাব"।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "হয়ত শহীদ মরহুমের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এই ওহীর ভিত্তিতেই তিনি বলেছিলেন যে, নিহত হওয়ার পর ছয় দিনের মধ্যে আমি জীবিত হয়ে যাব। কেননা, ঐ সময় শহীদ মরহুম 'মুনকাতেঈন' এ প্রবেশ করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাঁর সাথে করমর্দন করছিলেন।"

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ- এই শাহাদতকারী পবিত্র আত্মা সাহেবযাদা মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেবের আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থা তখন কেমন ছিল?

উত্তর ঃ- শাহাদতবরণকারী এই শাহাযাদার আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থা তখন কেমন ছিল তা বুঝতে হলে তিনি শাহাদতের পূর্বে ও শাহাদতের সময় যে দু'টি কুরআনী আয়াত পড়ে তার উল্লেখ করতে হয়। কাবুলের আমীরের পক্ষ থেকে তখন তাঁকে সঙ্গেসারের ধমক দেয়া হয় তখন তিনি বুঝে ফেলেন যে, তিনি মারা যাবেন। এ সময় তিনি এই আয়াতটি পড়েন ঃ

"রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিন্লা দুনকা রহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওহ্হাব" (সূরা আলে ইমরানঃআয়াত ৯)।

অর্থাৎ "হে আমাদের খোদা। আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না। তুমি আমাদেরকে যে হেদায়াত দিয়েছ উহার পদস্খলন হতে আমাদের রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

অতঃপর যখন তাঁকে সঙ্গেসার করা হতে লাগলো তখন তিনি এই আয়াত পড়েনঃ

"আন্তা ওলীই ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি তাওয়াফ্ফানী মুসলিমাঁও ওয়াল হিকনী বিস্ সলেহীন" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০২)।

অর্থাৎ "হে আমার খোদা! তুমি ইহকালে ও পরকালে আমার অভিভাবক ও বন্ধু। আমাকে ইসলামে মৃত্যু দাও এবং তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর"।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ- এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কোন বিশেষ কাশ্ফ এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে কি?

উত্তর ঃ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেনঃ

"আমি এক দিব্য-দর্শনে দেখলাম যে, 'সারো' নামক বৃক্ষের একটি লম্বা শাখা, যা অত্যন্ত সুন্দর ও সতেজ ছিল, তা আমাদের বাগান থেকে কাটা হয়েছে এবং উহা এক ব্যক্তির হাতে রয়েছে। তখন কোন একজন বললো, এই কর্তিত শাখাটি আমার গৃহের পার্শ্বে অবস্থিত ভূমিতে লাগিয়ে দাও। এটা আবার গজিয়ে ওঠবে। তখনি আমার নিকট ওহী হলো যে, কাবুলে কাটা হয়েছে এবং সরাসরি আমাদের দিকে এসেছে। ইহার আমি এই তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) করেছি যে, শহীদ মরহুমের রক্ত বীজের ন্যায় মাটিতে পড়েছে এবং ইহা অত্যন্ত ফলবান হয়ে আমার জামাতকে বৃদ্ধি করবে। একদিকে আমি স্বপ্ন দেখলাম এবং অন্যদিকে শহীদ মরহুম বলেন, ছয়দিনের মধ্যে আমাকে জীবিত করা হবে। আমার স্বপ্ন এবং শহীদ মরহুমের এই উক্তির পরিণাম একই।

-নাজির আহমদ ভূঁইয়া

ইস্‌লামী প্রতীকসমূহের ব্যবহার আহ্‌মাদী ফিরকার জন্য আইনতঃ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কি?

মাসিক মদীনা'র জানুয়ারী-২০০০ খৃ.-এর সংখ্যায় জেহাদ উদ্দীন তারেক কর্তৃক লিখিত "কাদিয়ানী কর্তৃক ইসলামের প্রতীকসমূহের ব্যবহার ঃ আইনের বক্তব্য" শিরোনামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনের উদ্ধৃতিসমূহ উল্লেখ করায় উহা একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনী দলিলরূপে অনেক পাঠকের নিকট বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা জানিবার প্রয়োজন হইলে অথবা লেখকের কোনও বক্তব্য পাঠকের নিকট ভ্রান্ত বা অযৌক্তিক বিবেচিত হইলে উত্তরের জন্য উহা লেখকের সমীপে উপস্থাপিত করা সমীচীন বিধায় উক্তরূপ প্রয়োজনে এই প্রবন্ধে বিজ্ঞ আইন বিশারদ জনাব জেহাদ উদ্দীন তারেক সমীপে কতগুলি আরয পেশ করিতেছি। 'মাসিক মদীনা'র মাননীয় সম্পাদক আমার এই প্রবন্ধ তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উদারতা ও মহানুভবতার অধিকারী হইলে ইহায় 'মাসিক মদীনা'ই পাঠাইতাম। কিন্তু, আমার আরযসমূহ উহাতে প্রকাশিত হইবার সম্ভবনা নাই বিধায় 'মাসিক মদীনা'য় ইহা প্রেরিত হইল না।

১। বিজ্ঞ আইনবিদ জনাব তারেক সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শুধু কাদিয়ানী কেন, পৃথিবীর কোনও অমুসলমান-ই ইসলাম ও মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীকসমূহ ব্যবহার করিতে পারে না। মুসলমানরাও অন্যান্য ধর্মের প্রতীকসমূহ ব্যবহার করিবে না।

এস্থলে বিজ্ঞ লেখকের নিকট আমার বিনীত প্রশ্নঃ-

(ক) লেখকের মতে পৃথিবীর মুসলিমনামধারী বিভিন্ন সম্প্রদায়, ফের্‌কা ও দল-উপদলের মধ্য হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়, ফের্‌কা ও দল-উপদলের মধ্য হইতে কোন্ কোন্ সম্প্রদায়, ফের্‌কা ও দল-উপদল অমুসলিম বলিয়া বিবেচিত? এস্থলে আমি পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক মুসলিমনামধারী ফের্‌কা অথবা দল-উপদলের মধ্য হইতে এইরূপ কতগুলি ফের্‌কা ও দল-উপদলের নাম উল্লেখ করিতেছি- যাহাদের প্রত্যেক ফের্‌কা বা দল-উপদল অন্যান্য মুসলমানের অন্ততঃ একটি ফের্‌কা বা দল-উপদলের ফতোয়া অনুযায়ী কাফির ও অমুস্‌লিম। উক্তরূপ কয়েকটি ফের্‌কা ও দল-উপদলের নাম নিম্নরূপঃ দেওবন্দী; বেরেলুবী; শীআ ইসনা আশারিয়্যাঃ; ইস্‌মাঈলী বা আগাখানী শীআ; ঈরানের আয়াতুল্লাহ্ রূহুল্লাহ্‌পন্থী শীআ; আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়; সায়্যিদ আবুল-আলা মাওদূদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইস্‌লামী; ওহাবী ও দেওবন্দী ফের্‌কা। কুফ্‌রী ফতোয়াপ্রাপ্ত অতীত যুগের অসংখ্য মুস্‌লিম মনীষী, ফাকীহ ও ইমামের মধ্য হইতে অতি অল্প কয়েক জন ব্যক্তির নামঃ- ইমাম আবূ হানীফা; মুহাম্মাদ আল-ফাকীহ্; যুন্‌নূন মিস্‌রী; আহ্‌মাদ রাওয়ান্দী; ইব্‌নে হান্নান; মান্‌সূর হাল্লাজ; ইমাম গায্‌যালী; শেখ আবুল হাসান শায্‌লী; বুখারী শরীফের সংকলক ইমাম বুখারী। উপরোক্ত ফের্‌কাসমূহ এবং ব্যক্তিগণ ব্যতীত বাংলাদেশের দেওয়ানবাগী পীর সাহেব ও তাঁহার অনুসারীগণ এবং সারা পৃথিবীর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (=Secularist) মুসলমানগণও বিরুদ্ধবাদী পীর মাশায়েখের ফতোয়া অনুযায়ী কাফির। যাহারা ক্ষমতায় গিয়া আল্লাহ্‌র-আইন যেমনঃ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিধান- জারী করে না, তাহারা ও এবং যাহারা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুস্‌লিম-প্রধান দেশে ক্ষমতাসীন হইবার পর এ পর্যন্ত আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুস্‌লিম ঘোষণা করতঃ তাহাদের সকল তৎপরতা ও কর্মকান্ড বেআইনী করিয়া দেয় নাই এবং তাহাদিগকে মৃত্যুদন্ড দেয় নাই, তাহারাও আলেম এবং পীর-মাশায়েখের ফতোয়া অনুযায়ী কাফির। বিজ্ঞ আইনবিদ তারেক সাহেবের নিকট বিনীত প্রশ্ন- উপরোক্ত সম্প্রদায়, ফের্‌কা, দল-উপদল, সরকার, সরকারী সাবেক মন্ত্রীগণ, বর্তমান মন্ত্রীগণ এবং অতীত যুগের উপরোক্ত ইমামগণ ও তাঁহাদের ভক্ত-অনুসারীগণের জন্য ইস্‌লামী প্রতীকসমূহের ব্যবহার আইনতঃ নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ নহে কি? আপনি মাসিক মদীনা পত্রিকায় উত্তর জানাইলে-ই কৃতজ্ঞ হইব। উত্তর জানাইয়া কৃতজ্ঞ করিবেন। এস্থলে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আপনার সমীপে উত্থাপন করিবার অবকাশ রহিয়াছে। উহা এই যে, বাংলাদেশের যে সকল সাবেক সরকার এবং যে বর্তমান সরকার আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে আইনতঃ নিষিদ্ধ করে নাই অথবা উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে হত্যা করে নাই, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কোনও ইসলামী সরকার কায়েম হইলে কি উক্ত সাবেক সরকারসমূহ ও বর্তমান সরকারের অন্ততঃ মন্ত্রীদিগকে কতল করা ভবিষ্যৎ সেই ইস্‌লামী সরকারের জন্য কর্তব্য হইবে? আর এইরূপ কতলের শাস্তি চলিতে চলিতে দেওয়ানবাগীসহ কাহাদের পর্যন্ত গিয়া ঠেকিবে? অথবা উহা আদৌ কোথাও ঠেকিবে না; বরং উহা অব্যাহতভাবে চলিতে-ই থাকিবে? থাক সে প্রশ্ন। তবে আপনি উত্তর দিলে আমরা খুশী-ই হইব; অখুশী হইব না।

(খ) মুসলমানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কী? ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের পাঞ্জাব দাঙ্গা তদন্ত আদালতের সুবিজ্ঞ বিচারপতিগণ বিভিন্ন বিশিষ্ট আলেমের নিকট "মুসলমান"-এর সংজ্ঞা জানিতে চাহিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, উহার ভিত্তিতে তাঁহারা দুঃখের সহিত তদন্ত-রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "মুসলমান"-এর সংজ্ঞা বর্ণনায় আমরা মাত্র দুই জন আলেমের মধ্যেও মতৈক্য দেখিতে পাই নাই। তদন্ত-আদালত য। বলে, বলুক। বিজ্ঞ আইনবিদ জনাব তারেক সাহেবের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন- সারা পৃথিবীর সকল আলেম না হউক, অন্ততঃ বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ আলেমের মধ্য হইতে মাত্র কয়েক শত

আলেম কি "মুসলমান"-এর একটি সুনির্দিষ্ট সর্বসম্মত সংজ্ঞা বর্ণনা করিতে পারেন ? যদি তাঁহারা পারেন, তবে আপনি তাহাদের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করতঃ 'মাসিক মদীনা'য় প্রকাশ করুন; কারণ, আপনি অমুস্‌লিমদের জন্য ইস্‌লামী প্রতীকসমূহের ব্যবহার আইনতঃ নিষিদ্ধ হইবার দাবী তুলিয়াছেন। তবে আমি আগে-ই আপনার খেদমতে আরয করিয়া রাখিতেছি–আপনি যে সংজ্ঞা 'মাসিক মদীনা'য় প্রকাশ করিবেন, উহার বিরুদ্ধে কেহ কুর্‌আন মাজীদ অথবা সহীহ্ হাদীছের আলোকে কোনও প্রশ্ন করিলে উহার কুর্‌আন-হাদীছ ভিত্তিক উত্তর দেওয়াও আপনার কর্তব্য হইবে। এজন্য আপনাকে অবশ্য-ই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অবশ্য সংজ্ঞাটি কুর্‌আন-হাদীছ-সম্মত হইলে উহাকে নিশ্চয়-ই সানন্দে লুফিয়া লওয়া হইবে।

(গ) উম্মুল-মুমিনীন হয্‌রত আয়েশা (রা), বড়পীর হয্‌রত আব্‌দুল-কাদির জীলানী, সূফীকুল-শিরোমনি হয্‌রত মুহিয়্যুদ্দীন ইবনে আরাবী, ইমাম আব্‌দুল-ওয়াহ্‌হাব শা'রাণী, দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা আব্‌দুল-হাই লাখনাবী, মেশ্‌কাত শরীফের শরাহ-লেখক মোল্লা আলী আল-কারী এবং ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী হযরত সায়্যিদ আহ্‌মদ সারহেন্দী–ইহারা সকলে রসূলে কারীম মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-কে খাতামুন্নাবিয়্যীনও মানিতেন এবং তাঁহার পর তাঁহার শারীআতের অধীন নবীর আগমনের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে বলিয়াও বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের বর্ণনায় অথবা তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে তাঁহাদের উক্ত আকীদা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বিবৃত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় বিজ্ঞ লেখক তারেক সাহেবের সমীপে আমার বিনীত প্রশ্ন–উপরোল্লেখিত ব্যক্তিগণ "মুসলমান"-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কি মুসলমান ছিলেন? উত্তর দিয়া কৃতজ্ঞ করিবেন। আল্লাহ্ আপনাকে পুরস্কৃত করিবেন। এস্থলে জনাব তারেক সাহেবের খেদমতে আরেকটি আরয। মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী তাঁহার 'নাশরুত-তীব ফী যিক্‌রিন্নাবিয়্যিল-হাবীব' নামীয় গ্রন্থে এবং মাওলানা মুফ্‌তী শফী তাঁহার খত্‌মে নুবুউওয়াত গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের এই অংশটিও বর্ণনা করিয়াছেনঃ নাবী উহা মিনহা এই উম্মাতের-অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদিয়্যাঃর -নবী এই উম্মাতের মধ্য হইতে-ই হইবেন।" উক্ত উভয় ব্যক্তি-ই তাঁহাদের উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত হাদীছকে সহীহ্ ও গ্রহণীয় হাদীছ রূপে স্থান দিয়াছেন। এস্থলে আমার প্রশ্ন–উক্ত লেখকদ্বয় উপরোক্ত হাদীছ ও উহাতে বর্ণিত বিষয়কে সহীহ্ মনে করা সত্ত্বেও তাঁহারা রসূলে কারীম (সঃ)-এর পর তাঁহার উম্মাতের মধ্য হইতে তাঁহার শারীআতের অধীন নবী-র আগমনের পথ বন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের উক্ত বিশ্বাস এবং উক্ত হাদীছকে তাঁহাদের সহীহ্ মনে করা কি পরস্পর-বিরোধী আকীদা নহে?

(ঘ) ইস্‌লাম ও মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীকসমূহ কী কী? সবগুলি না হউক অন্ততঃ উদাহরণস্বরূপ কতগুলি প্রতীক উল্লেখ করুন। আলেম সমাজ ইস্‌লামী পরিভাষা নাম দিয়া মাঝে মাঝে কতগুলি আরবী শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমনঃ ইস্‌লাম, মুস্‌লিম' কাফির, মাস্‌জিদ, আযান, মুআয্‌যিন, সলাত, সওম, যাকাত, হাজ্জ, কলেমা, কুর্‌আন, আল্লাহ্, মুহাম্মাদ, নবী, রসূল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রসূলুল্লাহ্, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

এস্থলে বিজ্ঞ লেখক জনাব তারেক সাহেবের সমীপে আমার বিনীত প্রশ্ন–এ সকল শব্দের ব্যবহার শুধু মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কে? আল্লাহ্–রসূল অথবা অন্য কেহ? আরও কথা আছে। আপনার মতে অমুস্‌লিমগণ কি নিজেদের জন্য 'আল-হাক্ক' বা 'সত্য'-এই শব্দদ্বয়কে ব্যবহার করিবার অধিকার রাখে? অন্য কথায় বলা যায়-একজন ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান কি "আমি সত্যের অনুসারী" অথবা "আমি সত্য ধর্মের অনুসারী"-এই কথা বলিবার অধিকার রাখে? খৃষ্টান পাদরীগণ তাহাদের ত্রিত্ববাদের ধর্মকে 'সত্য ধর্ম' বলিয়া মুস্‌লিম জাহানসহ দুনিয়াময় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। এক্ষেত্রে তাহাদের উক্তরূপ প্রচার-কে আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কি মুস্‌লিম শাসকগণের জন্য যরূরী নহে ?

(ঙ) ইস্‌লামী আইনের মূল উৎস কুর্‌আন–সুন্নাহ্। একজন মুসলমান শুধু কুর্‌আন–সুন্নাহ্ হইতে গৃহীত আইনকে জারী করিবার জন্য দাবী জানাইতে পারে। যে আইন কুর্‌আন–সুন্নাহ-বিরোধী, তাহা জারী করিবার দাবী কোনও মুসলমান জানাইতে পারে না। যে আইন কুর্‌আন-সুন্নাহ্‌য় বর্ণিত হয় নাই আবার উহা কুর্‌আন-সুন্নাহ্‌র বিরোধীও নহে, সে আইন মানা মুসলমানের জন্য ফরয নহে। এস্থলে বিজ্ঞ লেখক জনাব তারেক সাহেবের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন- তথাকথিত ইস্‌লামী পরিভাষা ও প্রতীক ব্যবহারের অধিকার অমুস্‌লিমগণ রাখে না -এ আইন উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্য হইতে কোন্ শ্রেণীর আইন?

(২) জনাব তারেক সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ দেশের কোম্পানী-আইনের উল্লেখ করতঃ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুক্তি ও আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক কোম্পানীর জন্য এবং উহাতে উৎপন্ন পণ্যের জন্য এইরূপ স্বাতন্ত্র্যসূচক নির্দিষ্ট প্রতীক রাখিবার অধিকার রহিয়াছে- যাহা অন্য কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক কোম্পানী ব্যবহার করিবার অধিকার রাখিবে না। অনুরূপভাবে ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য এইরূপ স্বাতন্ত্র্যসূচক নির্দিষ্ট প্রতীক বা প্রতীকসমূহ রাখিবার অধিকার রহিয়াছে - যাহা অন্য কোনও ধর্মের অনুসারীগণ ব্যবহার করিতে পারিবে না- ব্যবহার করিবার অধিকারও রাখিবে না। জনাব তারেক সাহেবের মতে আহ্‌মাদী সম্প্রদায় যেহেতু মুসলিম নহে, তাই অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায় আহ্‌মাদী সম্প্রদায়ও মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীকসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকার রাখে না।

এস্থলে আইন-বিশেষজ্ঞ জনাব তারেক সাহেবের সমীপে আমার কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন রহিয়াছেঃ-

প্রথম প্রশ্ন-যে আইনটিকে আপনি অবশ্য-পালনীয় আইনরূপে প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাহাতো কুরআন মাজীদ অথবা সহীহ্

হাদীছে বর্ণিত থাকা জরুরী। আপনার আইনটি কি কুরআন মাজীদ অথবা সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে? আপনি বলিতে পারেন- 'সব আইন কুরআন মাজীদ অথবা সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত থাকা যরুরী নহে; বরং যে আইন যুক্তির কষ্টিপাথরের যাচাইয়ে টিকে, উহাও পালনীয় আইন হয়। আর উপরোক্ত আইন যেহেতু যুক্তির বিচারে অত্যন্ত সঙ্গত, তাই উহাও অবশ্য প্রযোজ্য ও অবশ্য পালনীয় আইন।' আপনার উক্ত সম্ভাব্য উত্তরের পর্যালোচনায় কিছু কথা আছে। প্রথম কথা এই যে, যে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি আপনার মতে ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যরূপ ইসলাম-বিরোধী অতএব অবশ্য-বর্জ্জনীয়, সেই ধর্ম-নিরপেক্ষতার অনুসারী পাশ্চাত্য দেশসমূহ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কিত আইনের দৃষ্টান্ত টানিয়া আনিয়া উহাকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে যক্তিসঙ্গত মনে করেন কী রূপে? দ্বিতীয় কথা এই যে, যুক্তির বিচারে বৈষয়িক ব্যাপারে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক কোম্পানী অথবা একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নিজের জন্য শুধু এতটুকু স্বাতন্ত্র্যসূচক নাম অথবা প্রতীক অথবা উভয়বিধ চিহ্নকে নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত করিয়া লইবার অধিকার রাখে- যাহা তাহার নিজের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যটুকু প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট এবং যাহা অন্যের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করায় বাধা না দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কোনও দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরনের কম্পিউটার নির্মাণ করিল। এ ক্ষেত্রে সেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি দাবী করিতে পারে না যে, 'অন্য কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার নির্মাণ করিলে সে উহাকে কম্পিউটার নাম দিতে পারিবে না এবং সে কম্পিউটার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত নাম ব্যবহার করিবার এবং উহাদিগকে নির্মাণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশসমূহের পরস্পর সংযোজন করিবার আইনগত অধিকার পাইবে না এবং সে কম্পিউটার নির্মাণ করিলে নিজে উহা ব্যবহার করিতে অথবা বাজারে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না।' তাহার উক্তরূপ দাবী যৌক্তিক বিচারে এবং আইনের বিচারে সম্পূর্ণতঃ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে সে নিজের কারখানায় নির্মিত কম্পিউটারকে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনও বিশেষণে বিশোষিত করিয়া-যেমনঃ প্রস্তুতকারী কোম্পানীর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া অথবা কোনও প্রতীক ব্যবহার করিয়া-উহাকে নিজে ব্যবহার ও বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। যৌক্তিক বিচারে শুধু উপরোক্তরূপ স্বাতন্ত্র্যটুকু পাইবার অধিকার সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের রহিয়াছে।

এখন দেখা যাক- বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কিত উপরোক্ত যুক্তি ও আইনকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং ব্যাপকতর অর্থে চিন্তা জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে আমরা কী ফল লাভ করিতে পারি?

প্রত্যেক মানুষ যে-কোনও মতবাদ এবং যে-কোনও ধর্মমত পোষণ, পালন ও প্রচার করিবার অধিকার রাখে। কোনও যুক্তি এবং কোনও আইন তাহার উক্ত অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে না- কাড়িয়া লইবার অধিকার রাখে না। ধর্মজগত ও চিন্তাজগতের ক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কিত পূর্বোল্লেখিত যুক্তি ও আইনকে প্রয়োগ করিবার কালে আমাদিগকে মানুষের উক্ত ধর্মীয় ও মননগত স্বাধীনতাকে অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে। ভাষার ব্যবহারের অধিকার বায়ুর ব্যবহারের অধিকারের ন্যায় অবারিত। কোনও মানুষ অথবা মানব-গোষ্ঠী যেরূপে বায়ুর ব্যবহারকে শুধু নিজের জন্য অথবা নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইবার অধিকার রাখে না, কোনও মতবাদ বা ধর্মমতের অনুসারী ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ও সেইরূপে কোনও ভাষাকে, ভাষার শব্দসম্ভারকে বা ভাষার বিশেষ বিশেষ কতগুলি শব্দকে শুধু নিজের জন্য অথবা নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া অপরের জন্য উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া লইবার অধিকার রাখে না। আর সে সেরূপ অধিকার রাখিবেই বা কীরূপে? আরবী "ইসলাম" শব্দটির অর্থ- আত্মসমর্পণ, শান্তিপ্রদান এবং (উক্ত অর্থ হইতে) আল্লাহ্তাআলার নিকট আত্মসমর্পণমূলক এবং সকল সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সত্যের নিকট আত্মসমর্পণমূলক শান্তিময় একটি ধর্ম। ইস্লাম শব্দ হইতে গঠিত কর্তৃবাচ্যার্থক বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ " মুসলিম"। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যায় ও অসত্যের অনুসারী পক্ষ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে প্রথমোক্ত পক্ষের উক্ত কার্য্যকে আরবীতে 'ইসলাম' এবং উক্ত পক্ষকে 'মুসলিম' বলা যায়-বলা হয়ও। জনাব তারেক সাহেব বলিতে পারেন-' উক্তরূপ ব্যবহার ইসলাম শব্দকে উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার। পারিভাষিকভাবে উহাকে কেহ বিশেষ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও অর্থে ব্যবহার করিবার অধিকার রাখে না।' বলি- 'ইসলাম' শব্দকে আপনি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেন বলিয়া অন্যেরা তাহাদের বিশেষ পারিভাষিক অর্থে উহাকে ব্যবহার করিবার অধিকার হারাইবে কেন? যদি কেহ উক্ত শব্দকে "আল্লাহ্তাআলার প্রতি আনুগত্যমূলক এবং তাহার ধারণা অনুযায়ী সকল সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি আনুগত্যমূলক ধর্ম" অর্থে ব্যবহার করে, তবে উক্তরূপ ব্যবহার নিষিদ্ধ ও বেআইনী হইবে কোন্ যুক্তিতে? কোনও ব্যক্তি কুরআন মাজীদে বর্ণিত ইসলামকে গ্রহণ করিবার পর উহা ত্যাগ করিলে আপনি তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ন্যায় ও সত্য মনে করেন। পক্ষান্তরে, অন্য কোনও ব্যক্তি নিজে কুরআন মাজীদে বর্ণিত ইসলামকে মহাসত্য বলিয়া দৃঢ় ঈমান রাখিলেও ইসলামত্যাগী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড অথবা অন্য কোনরূপ শাস্তি প্রদানকে কুরআন -বিরোধী জঘন্য অন্যায় ও জঘন্য অসত্য মনে করে। আপনার কাছে যাহা মহাসত্য ও মহান্যায্য, অন্যের কাছে তাহা কুরআনবিরোধী জঘন্য অন্যায় ও জঘন্য মিথ্যা। আপনার ন্যায় ও সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা অর্থাৎ উহাকে ন্যায় ও সত্য বলিয়া মান্য করা ' ইসলাম' অথবা ইসলামী বিধানের প্রতি আনুগত্য নামে অভিহিত হইবার অধিকার রাখিলে অন্যের ন্যায় ও সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা অর্থাৎ উহাকে ন্যায় ও সত্য বলিয়া মান্য করা 'ইসলাম' অথবা

ইসলামী বিধানের প্রতি আনুগত্য নাম অভিহিত হইবার অধিকার রাখিবে না কেন ? পূর্ণ ধর্মটির ক্ষেত্রেও ঐ এক-ই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সঃ), কুর্আন, কলেমা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রসূলুল্লাহ্, সালাত, সওম, যাকাত, হাজ্জ, মাস্জিদ, আযান ইত্যাদি শত শত–বরং হাযার হাযার– শব্দ ও বাক্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং উহা দ্বারা প্রকাশিত আচার-আচরণ পালনের ক্ষেত্রেও ঐ এক-ই কথা প্রযোজ্য।

হ্যাঁ! এবার আমরা স্বাতন্ত্র্যসূচক ধর্মীয় প্রতীক বিষয়ে আলোচনা করিব। জনাব তারেক সাহেবের ধর্মমত এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের ধর্মমত– বিরুদ্ধবাদীদের ধর্মমতের নাম ইসলাম হউক অথবা অন্য যাহা-ই হউক– এতদুভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীক অথবা প্রতীক সমূহ বর্তমান থাকা জরুরী। হ্যাঁ! জরুরী-ই তো বটে। তবে, তারেক সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দেই– আধ্যাত্মিক জগতের প্রতীক জড়ীয় নহে, বরং আধ্যাত্মিক-ই হইয়া থাকে– আধ্যাত্মিক হওয়া-ই যুক্তিযুক্ত। আধ্যাত্মিক প্রতীককে জড়ীয় চক্ষু দ্বারা নহে, বরং জ্ঞান-বুদ্ধি তথা আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে হয়। জনাব তারেক সাহেব আধ্যাত্মিক প্রতীক দেখিতে গিয়া শুধু বিভিন্ন কোম্পানীর কম্পিউটারের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীক দেখিবার জন্য প্রয়োজনীয় চর্মচক্ষুকে যথেষ্ট মনে করিলে ঠকিবেন।

ধর্ম জগতের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীকের পরিচয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ভূমিকা শেষ। এবার স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীকের কথা বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্মমতের অনুসারীগণ এক বা একাধিক স্বতন্ত্র আকীদা বিশ্বাস পোষণ এবং তদনুযায়ী স্বতন্ত্র কার্য্য করিয়া থাকে। উহা-ই তাহাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীক বা প্রতীক-সমূহ। আর এই স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীক বা প্রতীকসমূহের সন্ধানলাভ-ই তো আমাদের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচক আইনজ্ঞ জনাব জেহাদ উদ্দীন তারেক সাহেবের অতীব কাম্য বস্তু। খৃষ্টান, য়াহুদী, পৌত্তলিক, বৌদ্ধ, অগ্নি-উপাসক, প্রকৃতি-পূজারী, জৈন, ইরানের খোমেনীপন্থী শীআ, ইস্মাঈলী শীআ, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযিলা, দেওবন্দী, বেরেলুবী, ওহাবী, বেদআতী, মাওদূদী পন্থী জামাআতে ইস্লামী, দেওয়ান বাগী পন্থী আশেকীনে রসূল, সুন্নী, গায়ের সুন্নী, আহ্মাদী, গায়ের আহ্মাদী-প্রত্যেকে-ই স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক আকীদা-বিশ্বাসের প্রতীক দ্বারা স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্র প্রতীক দেখিয়া জনাব তারেক সাহেব প্রত্যেককে চিনিয়া লইবেন এবং প্রয়োজনে গোমরাহী হইতে আত্মরক্ষা করিবেন।

প্রকৃতপক্ষে জনাব তারেক সাহেবরা প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উহার স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক প্রতীক দেখিয়া চিনিয়াও থাকেন। আর চিনিয়া থাকেন বলিয়া-ই তো তাহারা কুর্আন মাজীদে বর্ণিত ইস্লামকে কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে নহে, বরং তাহাদের নিজস্ব পর-মত-অসহিষ্ণু তথা-কথিত ইস্লামকে যুক্তির ঘোরে নহে, বরং গায়ের যোরে কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে কখনওবা দেওয়ানবাগী পন্থীদের উপর, কখনওবা (পাকিস্তানে) শীআদের উপর, কখনওবা আহ্মাদীদের উপর এবং কখনওবা অন্য কোনও ভিন্নমতাবলম্বী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর বর্বর হামলা চালাইয়া থাকেন।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন– কে কুর্আন মাজীদের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী মুসলমান আর কে শুধু উহার শিক্ষার অনুসারী হইবার দাবীদার মুসলমান কিন্তু উহার প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী মুসলমান নহে– তাহা কে নির্ধারণ করিবে ?

জনাব তারেক সাহেব বলিতে পারেন–মুসলমান নামধারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্য হইতে যে সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সম্প্রদায়-ই উহা নির্ধারণ করিবে। নির্ধারণ করিবার অধিকার একমাত্র তাহারা-ই রাখে।

এ ক্ষেত্রে জনাব তারেক সাহেব সমীপে আমার নিবেদন এই যে, রসূলে কারীম (সঃ) তাঁহার উম্মাতের চরম আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের যুগে তাহাদের তেহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হইবার কথা বর্ণনা করিবার পর এবং তেহাত্তর ফের্কার মধ্য হইতে একটি মাত্র ফের্কা ছাড়া সকল ফের্কার লোকদের জাহান্নামী হইবার কথা বর্ণনা করিবার পর 'কোন্ ফের্কা নাজী ফের্কা অর্থাৎ দোযখে যাওয়া হইতে মুক্তি লাভকারী জান্নাতী ফের্কা হইবে'–সাহাবীগণের এই প্রশ্নের উত্তরে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ফের্কা জান্নাতী হইবে' –একথা না বলিয়া বরং বলিয়াছিলেন, "আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে আছি– সেই পথের অনুসারীগণ নাজী ফের্কা।" ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর যুগেও প্রথম দিকে তাঁহার অনুসারীগণের অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় সংখ্যালঘু হইবার কথা রহিয়াছে। সকল নবী-র যুগেই প্রথম দিকে তাঁহাদের অনুসারীগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং অতি দুর্বল ছিল। এখন আমাদের আইন-বিশেষজ্ঞ জনাব তারেক সাহেব বলুন– সে সকল যুগের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মু'মিনগণ 'সত্যপন্থী ও সত্যের অনুসারী' নামে এবং তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরুদ্ধবাদীগণ– যাহারা নিজদিগকে সত্যের অনুসারী এবং মু'মিনদিগকে 'গোমরাহ্ ও সত্য-বিরোধী' নামে অভিহিত করিত– 'গোম্রাহ্ ও মিথ্যার অনুসারী নামে অভিহিত হইতে পারিবে কিনা। জনাব তারেক সাহেব! ধর্মের ব্যাপারটি প্রকৃত-ই স্বাধীনতার ব্যাপার। এখানে অন্যের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যে-কোনও ধর্মমত পোষণ, পালন ও প্রচার করিবার নৈতিক ও যৌক্তিক অধিকার রাখে। অন্যের কাছে তাহার ধর্মমত মিথ্যা ও বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহাকে উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার আপনার, আমার বা অন্য কাহারও নাই। আমি আমার ধর্মমতের নাম কী রাখিব, আমি আমার ধর্মীয় কার্য্যকলাপ ও অনুষ্ঠানাদিকে কোন্ নামে অভিহিত করিব এবং আমি আমার ধর্মীয় বিষয়াদিতে কী প্রতীক ব্যবহার করিব, তাহা নির্ধারণ করিবার মালিক আপনি নহেন বরং আমি এবং শুধু আমি। ভ্রান্ত কিন্তু আপনাকেও আমি বলিতে পারি– যেমন আপনি আমাকে ভ্রান্ত বলিতে পারেন। আর ইস্লাম, মুসলমান প্রভৃতি পরিভাষা ও প্রতীকসমূহ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবার

জন্য আপনাকেও আমি অনুরোধ জানাইতে পারি– যেমন আপনি আমার ব্যাপারে দাবী জানাইতেছেন। ফায়্সালা কে দিবে। ফায়সালা আল্লাহ্তাআলা আখেরাতে দিবেন। তিনি আপনাকে ও আমাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর সঠিক উত্তর ও ভুল উত্তর-এতদুভয়ের যে কোনও একটি লিখিবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। সে অধিকার আল্লাহ্তাআলা মানুষকে দিয়াছেনও। জনাব তারেক সাহেব! দয়া করিয়া আল্লাহ্তাআলাকে আমার ও আপনার পরীক্ষা লইতে দিন। যে পরীক্ষার্থী অন্য পরীক্ষার্থীকে নিজের ধারণায় ভুল উত্তর লিখিতে দেখিয়া তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে তথা আল্লাহ্তাআলার মহান পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্যকে বিঘ্নিত করিতে চেষ্টা করে, সেই শক্তিপ্রয়োগকারী খোদাদ্রোহী ব্যক্তিকে আল্লাহ্তাআলা শাস্তি দিবেন না অথবা হালকা শাস্তি দিবেন– এরূপ মনে করা চরম বিভ্রান্তি। এস্থলে আমি কুর্আন মাজীদের সূরায়ে বাকারাঃর ২৫৭ নং আয়াত, সূরায় হূদের ২৯ নং আয়াত, সূরায়ে কাহাফের ৩০ নং আয়াত এবং সূরায়ে বুরূজকে হয্রত ঈসা (আঃ)-এর যুগের য়াহুদী আলেমগণের অন্তর লইয়া নহে, বরং রসূলে কারীম (সঃ)-এর যুগের য়াহুদী আলেম আব্দুল্লাহ ইব্নে সালামের অন্তর লইয়া বিনয় ও মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত করিতে জনাব তারেক সাহেবের নিকট সানুনয় অনুরোধ জানাই। সংক্ষেপ করণের প্রয়োজনে এখানে উহা উদ্ধৃত করা হইতে বিরত রহিতেছি।

জনাব তারেক সাহেব বলিতে পারেন– পরস্পর বিরোধী সকল মুস্লিম সম্প্রদায় সকলে মিলিয়া মুস্লিম নামধারী যে সম্প্রদায়কে কাফের বা অমুস্লিম বলিয়া ফতোয়া দেয়, সেই সম্প্রদায়-ই অমুস্লিম বলিয়া নির্ধারিত হইবে।

জনাব তারেক সাহেব সমীপে আমার বিণীত নিবেদন–পবিত্র হাদীছে বর্ণিত তেহাত্তর ফের্কা-র মধ্য হইতে একটিমাত্র ফের্কা ছাড়া যে বাহাত্তর ফের্কার লোক জাহান্নামী হইবে, সেই বাহাত্তর ফের্কার লোকেরা সকলে মিলিয়া কি জান্নাতী দুর্বল ফের্কাটিকে জাহান্নামী ও কাফের বলিয়া ফতোয়া দিবে না? যদি তাহা-ই হয় এবং নিশ্চিত রূপে তাহা-ই হইবে, তবে বিণীত প্রশ্ন– এক্ষেত্রে আপনার ফতোয়া মানিব অথবা রসূলে কারীম (সঃ)-এর বাণী মানিব ? উত্তর দিবেন। –বাধিত হইব।

জনাব জেহাদ উদ্দীন তারেক সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে আহ্মাদিয়্যা মুস্লিম জামাআত-প্রকাশিত ইস্লামে-ই নবুউওয়াত নামীয় একখানা পুস্তক সম্পর্কিত সুপ্রীম কোর্টের রায় উল্লেখ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাহারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টিকারী কোনরূপ মৌখিক অথবা লিখিত বক্তব্য প্রকাশ করা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। আর যেহেতু আহ্মাদীগণ মুসলমানদের মৌলিক ধর্মীয় আকীদার বিরোধী ও বিপরীত আকীদা পোষণ করে এবং উহার প্রকাশ ও প্রচার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত দেয়, তাই আহ্মাদীগণ তাহাদের ধর্মমত প্রকাশও প্রচার করিবার অধিকারী নহে।

সুপ্রীম কোর্টের যুক্তিকে জনাব তারেক সাহেব নিজের যুক্তি হিসাবের গ্রহণ করিয়াছেন। আমি জনাব তারেক সাহেবের যুক্তি সম্পর্কে কিছু নিবেদন তাঁহার সমীপে পেশ করিতেছি। আশা করি, তিনি আমার নিবেদনের উত্তর দিবেন।

প্রথম নিবেদন ঃ সকল যুগে সকল নবী রসূল তাঁহাদের জাতিকে তাহাদের যালালাত ও গোম্রাহীর বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদিগকে গায়রুল্লাহ্র ইবাদাত ত্যাগ করতঃ একমাত্র আল্লাহ্তাআলার ইবাদাত করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

তাঁহাদের আহ্বান অতি আকুল ও ভালবাসাপূর্ণ হইলেও উহা অল্পসংখ্যক মানুষ ছাড়া সকলের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়াছে। এই আঘাতের কারণে-ই তো তাহারা শ্রেষ্ঠতম মানব-কল্যাণকামী নবী-রসূল ও তাঁহাদের অনুসারীদের উপর নৃশংসতম ও বর্বরতম অত্যাচার ও নির্যাতন চালাইয়াছে। সে ইতিহাস অনেক করুণ, অনেক মর্মন্তুদ। নবী রসূলগণ তো সত্য গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করেন নাই– করা যুক্তি-সংগতও ছিল না। তাঁহারা শুধু তাহাদিগকে সত্য গ্রহণের জন্য প্রেমময় আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আর উহা-ই এবং শুধু উহা-ই তাঁহাদের কওমের লোকদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করিয়াছিল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানব শ্রেষ্ঠতম মানব কল্যাণী রসূলে কারীম সায়্যিদুল-মুর্সালীন খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ) এবং তাঁহার সাহাবীগণের উপর এই কারণেই তো বর্বরতম অত্যাচার চালানো হইয়াছিল।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিবার অভিযোগ তুলিয়া কাহারও উপর অত্যাচার চালানো অথবা কাহাকেও তাহার মতবাদ বা ধর্মমত প্রকাশ ও প্রচার করিতে বাধা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি জঘন্য বর্বরতা ; যুগে যুগে বর্বর লোকেরা এই পথে মহামানবদের উপর নির্য্যাতন ও নিপীড়ন চালাইয়াছে এবং এখনও চালাইতেছে।

বর্বর খৃষ্টান পাদরীদের চাপে কয়েক শত বৎসর পূর্বে ইংল্যান্ডে ব্লাসফেমী আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল। উক্ত আইন প্রবর্তনের পশ্চাতেও সেই একই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিবার অজুহাত সক্রিয় ছিল। চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিরাট বিপ্লব ও রেনেসাঁ আসায় বর্তমানে ইংল্যান্ডে উক্ত বর্বর আইন কার্য্যতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে কেহ পাদরীদের ধারণা অনুযায়ী ব্লাসফেমী-র অপরাধ করিলেও উক্ত আইন অনুযায়ী তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয় না। "যিশু ঈশ্বর-পুত্র"– পাদরীদের এই মিথ্যা দাবীর বিরুদ্ধে যিশুকে অন্যান্য মানুষের ন্যায় আল্লাহ্র বান্দা বলিয়া দাবী করা ও ব্লাসফেমী আইনে দন্ডনীয় অপরাধ; কারণ, উহা ঈশ্বর-নিন্দা; অতএব, উহা অপরের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে। বর্তমানে অন্যান্য লেখকের রচনায় তো বটে-ই, খোদ বাইবেলের সহিতও উক্তরূপ তথা-কথিত ঈশ্বর-নিন্দামূলক কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে (দেখুন বাংলাদেশে প্রকাশিত বাংলা "ইঞ্জিল শরীফ")।

জনাব তারেক সাহেবের কাছে প্রশ্ন– ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিবার অপরাধে কোন্ কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখ বন্ধ করিতে

হইবে? এতদ্‌সহ প্রশ্ন–আপনার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখ খোলা রাখিতে হইবে অথবা বন্ধ ? খোলা রাখিতে হইলে কোন্ যুক্তিতে খোলা রাখিতে হইবে ? সে যুক্তি অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না কেন ? উত্তর দিবেন–কৃতজ্ঞ করিবেন।

(ক) উদাহরণ দিয়া বলিঃ প্রচলিত ত্রিত্ববাদমূলক খৃষ্টান ধর্ম হযরত ঈসা (আঃ)-কে ঈশ্বর পুত্র বলে। পক্ষান্তরে, কুর্‌আন মাজীদ উহাকে এইরূপ জঘন্য মিথ্যা, পাপ ও শির্‌ক বলিয়া আধ্যায়িত করিয়াছে– যাহার উচ্চারণে আসমান ও যমীন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়। এইরূপে ইস্‌লাম ধর্ম ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম ঘোর পরস্পর-বিরোধী। অনুরূপভাবে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম নিরীশ্বরবাদ শিক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে, অন্যান্য সকল ধর্ম ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং নিরীশ্বরবাদের ঘোর বিরোধী। প্রত্যেক ধর্মের প্রচার অন্য ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রচন্ডভাবে আহত করে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন ধর্মের প্রচারের আইনগত বৈধতা সম্বন্ধে আইন-বিশেষজ্ঞ জনাব তারেক সাহেবের রায় কী হইবে ?

দ্বিতীয় নিবেদন ঃ এক সময় ছিল– যখন আদালতের রায়ের বিরূপ সমালোচনা করা আদালত অবমাননার শামিল বলিয়া পরিগণিত হইত। সময় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মানুষের চিন্তাধারায়ও পরিবর্তন আসিয়াছে। এখন চিন্তাবিদগণ– এমনকি বিচারপতিগণও– বলিতে শুরু করিয়াছেন যে, আদালতের রায় –এমনকি সর্বোচ্চ আদালতের রায়ও সমালোচনার উর্দ্ধে নহে– উর্দ্ধে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে।

আদালতের বিচারকগণ সর্বক্ষেত্রে বিশ্ব-বিধাতা আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত আইন দেখিয়া বিচার করেন না। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে– এবং অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে– মানব রচিত আইন দেখিয়া তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। একমাত্র আল্লাহ-প্রদত্ত আইন অর্থাৎ কুর্‌আন মাজীদ ও সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত আইন-ই নিশ্চিতরূপে নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয়। মানব-রচিত আইন আল্লাহ্-রচিত আইনের বিরোধী না হইলে উহা অমান্য করা যরুরী নহে; কিন্তু উহা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের বিরোধী হইলে শক্তি থাকিলে উহা অমান্য করা জরুরী।

অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া যে-কোনও মতবাদ বা ধর্মমত–তাহা সংখ্যা গুরু জনগণের মতবাদ বা ধর্মমতের বিরোধী হইলেও পোষণ, পালন ও প্রচার করিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রহিয়াছে। কোনও দেশের আদালত যদি কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মমত সম্বলিত কোনও পুস্তককে বেআইনী অথবা বায়েয়াফ্‌ত্ বলিয়া রায় দেয়, তবে উহা মানব রচিত আইনের পরিপন্থী হউক অথবা না হউক– নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের পরিপন্থী। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কী ? জনাব তারেক সাহেব! কুর্‌আন হাদীছের দলীল প্রমাণসহ জানাইয়া কৃতজ্ঞ করিবেন।

জনাব তারেক সাহেব! মানব-রচিত আইনের পরিবর্তনশীলতার দুই একটি উদাহরণ আপনার সমীপে পেশ করিতেছি। পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করিবার অপরাধে হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের আইন আছে আবার কোনও কোনও দেশের হত্যাকারীর জন্য মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে লঘু দন্ডের আইন রহিয়াছে। কোনও কোনও দেশে পূর্বে এরূপ মৃত্যুদন্ডকে বর্বরতা ও নৃশংসতা বিবেচনা করা হইত এবং এখন আর উহা সেরূপ বিবেচনা করা হয় না। কোনও কোনও দেশে আবার উহার বিপরীত বিবেচনা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সে সকল দেশে পূর্বে এরূপ মৃত্যুদন্ডকে ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করা হইত এবং এখন উহাকে বর্বরতা ও নৃশংসতা বিবেচনা করা হয়।

অনুরূপভাবে মাথায় হেজাব বা স্কার্ফ দিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাত্রীদের জন্য এবং সরকারী কার্য্যালয়ে যাওয়া মহিলা কর্মচারীদের জন্য বেআইনী ও দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া কোনও কোনও দেশে ঘোষিত হইয়াছে। এই সকল দেশে পূর্বে উহা বেআইনী ছিল না। অন্যান্য দেশে উহা এখনও বেআইনী নহে।

মানব-রচিত আইনের উক্তরূপ পরিবর্তনশীলতা আমাদিগকে কী শিক্ষা দেয় –জনাব তারেক সাহেব বলিতে পারেন কি ?

প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ ঃ অন্যান্য সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় আহ্‌মাদী মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের ও স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীক বর্তমান রহিয়াছে; সুতরাং জনাব তারেক সাহেবের বিভ্রান্ত হইবার আশংকায় উদ্বিগ্ন হইবার দরকার নাই। আল্লাহ্-প্রদত্ত আইনের বিরোধী কোনও আইন বা রায় কাহারও উপর চাপাইয়া দিতে জনাব তারেক সাহেব চেষ্টা করিবেন না। জনাব তারেক সাহেব আপনি নিজে যে রূপে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতে চাহেন, পৃথিবীর অন্য সকল মানুষকে সেইরূপে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিন।

উপসংহার ঃ আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে বিশেষতঃ আইন-বিশেষজ্ঞ জনাব জেহাদ উদ্দীন তারেক সাহেবকে সত্যান্বেষী অন্তরের অধিকারী হইবার এবং কুর্‌আন মাজীদকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ও আঁকড়াইয়া থাকিবার তাওফীক দান করুন!

–মু. মায্‌হারুল-হক

(লেখকের বানান রীতিই হুবহু অনুসৃত হয়েছে-**নির্বাহী সম্পাদক**)

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর ৩০শে নভেম্বর '৯৯ এর সংখ্যায় মাওলানা মু. মায্‌হারুল-হক রচিত 'আহমদী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী বেআইনী ও অযৌক্তিক' নামক প্রবন্ধের শেষ পারার পূর্ববর্তী পারায় (৩৫ পৃঃ ২৯ লাইন) "মসজিদে বোমা রেখে নিরীহ মুসল্লীদের হত্যা ও আহত করার জন্য"–অংশটুকু বাদ দিয়ে পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

অনবধানবশতঃ এ ভুলের জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত– **নির্বাহী সম্পাদক**

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own. **with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.**

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

উপরে ঃ
চট্টগ্রাম জামাতে সালানা জলসার দৃশ্য

মাঝে ঃ
খুলনায় বোমার আঘাতে শাহাদত বরণকারী ৬ শহীদের মাযার যিয়ারত করছেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা রাজা নাসের আহমদ সাহেব।

নীচে ঃ
জামালপুর জোনের দেহাতী মোয়াল্লেম ও দাঈইলাল্লাহ্ সম্মেলনের একাংশ

New Vol. No. 62 ❑ 16th Issue

February 29, 2000 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

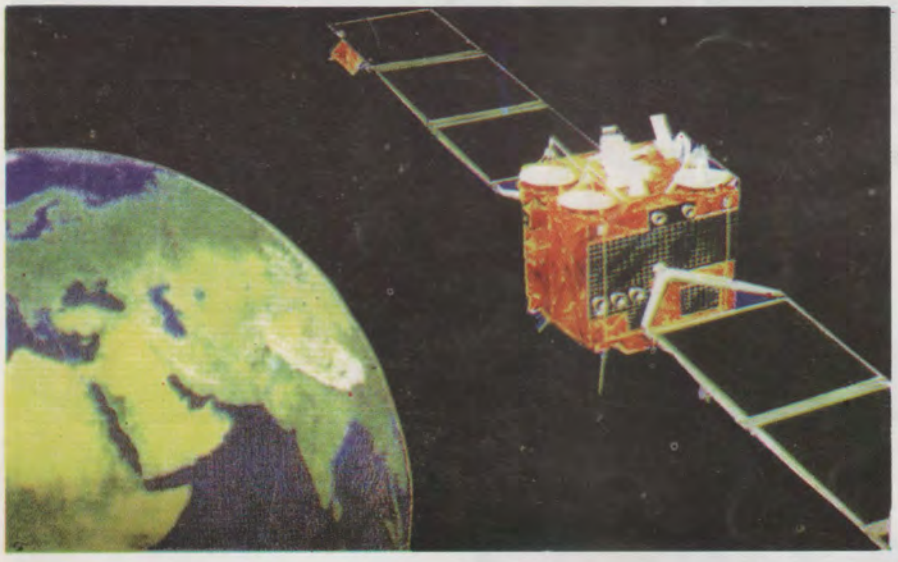

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ অহোরাত্র

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক বুধবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272